নাকু-গামা

লীলা মজুমদার

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা-সাত

লীলা মজুমদার

এক

এরোপ্লেনে চড়তে গামার বেজায় ভয়। নাকু বলল, 'ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমার বাবা সরকারি পরিকল্পনায় ধাতুর খনি-খোঁজা তেল-খোঁজার কাজ করেন, তা জানিস্? সে কি জিনিস বুঝলি তো?'

গামা বলল, 'না।'

নাকু চটে গেল। 'তাও জানিস না? আরে ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকটার মাটির তলায় তেলের পুকুর। সেই সব বাবা খুঁজে বেড়ায়।'

গামা বলল, 'ইস্!'

নাকু বিরক্ত হল। 'ইস্ আবার কি? তোর অত ভয়ই বা কিসের। বাবাদের আপিসের ছোট প্লেন। আমরা চারজন যাব। পাইলট, এঞ্জিনিয়ার, তুই আর আমি। সঙ্গে ভালো ভালো খাবার জিনিস থাকবে। যেতে এক ঘণ্টাও লাগবে না; খেতে খেতে গোয়ানার জঙ্গল পেরিয়ে, মরা জমির ধারে—'

গামা বলল, 'উঃ!'

'আবার কি হল?'

'মরা জিনিস ভালো, না।'

'ধেত্তেরি। তুই-ও যেমন। আরে এ সে-রকম মরা নয়। ওখানকার জমিতে গাছপালা ঘাস ঝোপ কিচ্ছু হয় না, তাই বলে মরা জমি। বনের মাঝে মাঝে ঐ রকম বহু জায়গা আছে, মরুভূমির মতো দেখতে। সবুজ কিছু হয় না তাতে।'

'কেন হয় না?'

'কি জানি। বাবা বলেন মাটির নিচে তেজস্ক্রিয় ধাতুর খনি আছে হয়তো, কিম্বা এমন কিছু যার প্রভাবে গাছপালা গজায় না। কোথাও হয়তো শুধু বালি, কিম্বা চোরাবালি।'

'ও বাবা, আমাকে বাদ দে।'

'কি মুশকিল, মাটির তলায় কি আছে না আছে বলে আকাশে উড়বি না কেন?'

'যদি পড়ে যাই?'

'দরজা তো বন্ধ থাকে।'

'শুনেছি যদি দরজা দৈবাৎ খুলে যায়, তাহলে সুড়ুৎ করে বাতাসে টেনে বের করে নেয়। দরকার নেই বাবা, আসছে বছর মামার বিয়ে হবে আমি বরযাত্রী হয়ে যাব।'

নাকু প্রায় হতাশ। 'কিসের সঙ্গে কি! আরে বাতাসে টেনে বের করলে আর আমার বাবাকে সাঁইত্রিশ দিনে সাতচল্লিশবার ঐ এরোপ্লেনে চড়তে হত না। চল্, তোকে সিনেমা দেখাব, শিক-কাবাব খাওয়াব, আমার নতুন ডট্-পেনটা দেব।'

গামার চোখ চকচক করে উঠল। 'দেখি পেনটা।'

নাকু কলম বের করে দিল। খানিক নেড়েচেড়ে দেখে গামা বলল, 'আচ্ছা, যাব। দিবি তো ঠিক?'

নাকু বলল, 'এরোপ্লেনে চড়েই দিয়ে দেব। তাহলে যদি বা দৈবাৎ—'

'যদি বা দৈবাৎ কি?'

'না, কিছু না। আজই বাবাকে লিখে দিচ্ছি। ১১ই আমার স্কুল বন্ধ, ১২ই সকালে আমরা যাচ্ছি। কি মজা!'

ঠিক তাই হল। ১২ই এয়ারপোর্টে এসে নাকু বলল, 'বাবা যেমন লিখেছিলেন, গরম সোয়েটার গেঞ্জি এনেছিস তো? আশা করি ভয়টা এত দিনে ঘুচেছে? আরে তুই বলিস তুই গোয়ানার মতো জঙ্গলেই মানুষ হয়েছিস। তোর বাবা বুনি-গাঁয়ের সরদার, তোর অত ভয় কিসের বুঝলাম না। ঐ যে সমরেশ-কাকা, আমাদের পাইলট। হেই, সমরেশ-কাকু, এই যে আমরা।'

সমরেশ-কাকুর সঙ্গে আরেকজন লোক। একমুখ দাড়ি-গোঁপ,

বেজায় হিংস্র চেহারা। গামা আরেকটু নাকুর গা ঘেঁষে বসল। নাকু বলল, 'কি হল? ও তো হামিদ-কাকা, ইঞ্জিনিয়ার। আমরা চারজন যাব।'

হামিদ-কাকা কাছে এসে ব্যস্ত-সমস্তভাবে বললেন, 'কই তোমরা রেডি তো? বড় কেউ সঙ্গে আসেননি? সে যাই হোক গে, কাগজপত্র এনেছ তো? দাও, দেখি। আর তোমাদের মাল কই? পনেরো, পনেরো, ত্রিশ কিলোর বেশি যেন না হয়, মনে আছে তো? ৫নং ক্যাম্প থেকে লোক উঠলে, বড় বেশি ভারী হয়ে যাবার ভয় থাকে।'

ছোট দুটি সুটকেস, পঁচিশ কিলোও হবে কি না সন্দেহ। গামা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, এতক্ষণ পরে ছোট এয়ার-পোর্টটাকে ভালো করে চেয়ে দেখল। লোকজন মালপত্রে গিজগিজ করছে। জঙ্গলের আর পার্বত্য অঞ্চলের মাল সরবরাহের আর যাতায়াতের এটাই একমাত্র পন্থা। রেলও নেই; রাস্তাও সব জায়গায় নেই; কাজেই ট্রাকও চলে না। কমলা, কবুতর, ডিম, স্টোভ, লণ্ঠন, সব মালবাহী প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছে।

নাকুরা ভোরে উঠে, বাসে চেপে ওদের ছোট শহরটি থেকে এখানে এসেছিল। ওখানে মামাবাড়িতে থেকে ও পড়ে। গামার সঙ্গে ছেলেদের ফুটবল ক্লাবে আলাপ। সে অন্য স্কুলে পড়ে। সে-ও নাকি মামাবাড়িতে থাকে। বলে নাকি গোয়ানার ঘোর জঙ্গলে ওদের বাড়ি। কি সব সাংঘাতিক সাহসের গল্প বলে, শুনলেও গায়ের লোম খাড়া হয়। অথচ ঐ এক গোঁ, কিছুতেই পৃথিবীর মাটি থেকে পা তুলবে না। বলে বনের দেবতার যদি তাই ইচ্ছা থাকত, তা হলে তো একজোড়া ডানাই দিতেন। মশাদের ডানা দিয়েছেন আর দরকার থাকলে মানুষকে কি আর দিতেন না? মশারা কি এমন ভালো!

ওদিকে মা লিখেছেন, 'ছুটিতে যদি আস, সমবয়সী একজন বন্ধুকে সঙ্গে এনো। গত বছরের মতো সারা ছুটি তোমাকে সামলানো আমার কর্ম নয়।'

প্রথম দিকে কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। পুজোর ছুটিতে ঘর-

বাড়ি ছেড়ে অচেনা জায়গায় কে যাবে? তাও আবার লজ্‌ঝড়ে প্লেনে চেপে। নাকুর মামা নাকুকেই সহজে ছাড়তে চাইছিলেন না। কথাটা একটু জানাজানি হলে পর, গামাই নিজে এসে বলেছিল, 'আমাকে নাও।' নাকু হাতে স্বর্গ পেল। অমনি গামা বলল, 'কিন্তু এরোপ্লেনে না, হেঁটে চল। আমি বনের পথ দেখাবার লোক সঙ্গে নেব। গোয়ানার জঙ্গলেই তাদের বাড়ি।'

তাতে যে নাকুর মা, বাবা, মামা ইত্যাদি কেউ রাজি হবেন না, অনেক কষ্টে সে-কথা তাকে বোঝাতে হল। তার ওপর রোজ চিঠিপত্র, সরকারি দলিল, খাবার, ওষুধ, কর্মচারী ইত্যাদি নিয়ে বিভাগীয় এরোপ্লেন যায়। ভাড়াও লাগবে না তাতে। শেষ পর্যন্ত গামা রাজী হয়েছিল। অবিশ্যি তাও শুধু ডট্-পেনটার লোভে।

প্লেনে উঠেই নাকু চেয়ে দেখল গামার কালো রোগা মুখটাতে ছাই মতো রঙ ধরেছে। নাকু আরো একবার প্লেনে চড়েছিল, তাই তার ভয়টয় কেটে গেছিল। সে বলল, 'একবার উড়ুক না, দেখবি কেমন মজা লাগবে।'

হামিদ-কাকা বেলট্ এঁটে দিয়ে গেলেন। সেদিন আর কেউ যাচ্ছে না, সুতরাং দেরি করার মানে হয় না। আকাশে উঠবার সময় গামা একবার গোল জানলা দিয়ে বাইরে দেখল, মাঠটা কাৎ হয়ে রয়েছে, ভাবল লোকগুলো কেন সড়-সড় করে পিছলে পড়ে যাচ্ছে না।

নাকু একগাল হেসে বলল, 'বলিনি মজা লাগবে! এই নে ধর, মাংসের সিঙ্গাড়া।'

গামা বলল, 'ওয়াক্!'

দুই

একবার উঁচুতে উঠে গেলে কিন্তু গামার মনে সাহস ফিরে এল, গা-গুলোনোও বন্ধ হল। নাকু ওর বেলট্ খুলে দিল। ভয়ে ভয়ে নিচে তাকিয়ে দেখল কি সুন্দর গাছপালা। ধারে কিছু ঘরবাড়ি, তারপর তাও নেই, শুধু ধান-খেত, তারপর শুধু বন। তারি মধ্যে সরু সুতোর মতো কত নদী গিয়ে বড় নদীতে পড়েছে। তাদের দু-পাশে হলদে বালির চড়া। মাঝে মাঝে আল-বাঁধানো ধান-খেত, তাদের ধারে ধারে সবুজ ঝোপ, যেন চৌখুপি নকশা দেওয়া কাঁথার সবুজ পাড়। তারপরেই ঘোর জঙ্গল; ফিকে সবুজ, ঘন সবুজ। সবুজেরই কত রকমফের। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, সবুজ সাগরে যেন ঢেউ উঠেছে।

তারপর মেঘ এসে ওদের ঘিরে ফেলল। এ-সব পাহাড়তলি জায়গায় হঠাৎ মেঘ হঠাৎ রোদ! পেটের ভিতর কেমন ফড়-ফড় করতে লাগল। প্লেনটা কখনো ওঠে, কখনো নামে। হামিদ-কাকু এসে আবার বেলট্ এঁটে দিলেন। বললেন, 'ও কিছু না।' নামার সময় মনে হলো পেটের তল নেই। গামা মাছের কচুরি চিবুনো বন্ধ করে কোমরের বেলট্ আঁকড়ে ধরল। প্লেনটা যেন এক দিকে বড় বেশি কাৎ হয়ে যাচ্ছে। গামা নাকুর দিকে তাকাতেই, নাকু চেঁচিয়ে বলল, 'ও হামিদ-কাকু, কিছু হল নাকি?'

হামিদ-কাকু উঠে এসে বললেন, 'এঁটে শক্ত হয়ে বস। কোনো ভয় নেই। আমরা এখানে মরা-জমিতে নামব।' শুনে গামার তো হাত-পা ঠাণ্ডা। 'না-ম-ব? কেন?'

হামিদ-কাকু বললেন, 'শুনতে পাচ্ছ না কট-কট শব্দ? তাই ভালোয় ভালোয় নেমে পড়াই ভালো।' বলেই পাইলটের পাশে গিয়ে বসলেন।

ভয়ের মজাই হল যে আগে যতটা ভয় করে, ভয় এসে ঘাড়ে চাপলে আর ততটা করে না। এদেরও তাই হল। নাকু বলল, 'একে ফোর্সড্ ল্যাণ্ডিং বলে।'

গামা আর কিছু বলার সময় পেল না। প্লেনটা সড়াৎ করে একেবারে অনেকখানি নিচে নেমে এল। তারপর দুলল, না ঘুরল, না ডিগবাজি খেল, বোঝা গেল না। মোট কথা শেষ পর্যন্ত হুড়মুড় চড়-চড় করে সত্যি সত্যি মাটি পেল। মাথা ঘুরতে লাগল, কানে তালা লাগল, বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করতে লাগল।

কেউ যে জখম হয়নি, তাও বলা যাচ্ছিল না। মাথা ঠোকাঠুকি, উল্‌টি-পাল্‌টিতে নাকু-গামার গা-ময় আঁচড়, কালসিটে, আলুর মতো গোল গোল ফোলা। নাকুর বাঁ হাতের কবজিতে খুব চোট লেগেছিল। গামাই বেলট্ দুটো খুলল। প্লেনটা নাক নিচু করে কাৎ হয়ে নচাড়া জমিতে গেড়ে বসেছিল। নিচের চাকার যে দফারফা সে আর বলে দিতে হবে না। নাকু গা ঝেড়ে বলল, 'উঃ! হাতে লাগল! তাহলে এ ভাবে নামলেই যে প্লেনে আগুন লেগে যায়, সে-কথাটা ভুল।'

গামা বলল, 'কিন্তু কাকুদের সাড়া-শব্দ নেই কেন?'

তাই তো। মরে-টরে যায়নি তো! তবেই তো হয়ে গেল! মরেনি। কিন্তু বেমক্কা অজ্ঞান। হামিদ-কাকুর পায়ে চোট লেগেছিল। বোধ হয় খুব বেশিই লেগেছিল। মুখটা বেজায় সাদা দেখাচ্ছিল। ওদের দেখেই শুকনো ঠোঁট চেটে বললেন, 'শিগ্‌গির জল আন।'

গামা ছুটে জল এনে দিল; সমরেশ-কাকুর মুখে মাথায় ছিটনো হল, জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে সমরেশ-কাকু চোখ মেললেন। নাকু মহা খুশি হয়ে বলল, 'গুরুজি কি ফতে!'

খুব একটা ফতে কিন্তু হল না। সমরেশ-কাকু চোখ মেললেন বটে, কিন্তু নড়েনও না চড়েনও না। একটা উফ্ বলেই ঠোঁট কামড়ে পড়ে রইলেন। নাকি শিরদাঁড়া জখম হয়েছে! নাকু খুব খুশি হতে পারল না। শিরদাঁড়া জখম হয়েছে আবার কি। তাছাড়া শিরদাঁড়া দিয়ে তো আর

প্লেন চালাবেন না। ওদিকে দেরি দেখলে মা-বাবা ব্যস্ত হবেন না ?

হামিদ-কাকু কর্কশ গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন। 'ব্যস্ত হবেন তো যাও না, তাঁদের নিশ্চিন্ত কর-গে। তোমরা হোঁৎকা-হোঁৎকা দু-জন রয়েছ কি করতে ? নাম, রওনা দাও, অন্ধকার হবার আগে যতটা পার এগোও। রাতে গাছে চড়, নইলে বাঘে খাবে।'

এই নাকি হাসি-খুশি হামিদ-কাকু ! একটু একটু করে নাকুর ফরসা গোল-গাল মুখটা লাল হয়ে উঠল। গামা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'কি ভয় দেখাচ্ছেন, তাই যাব। কোনদিকে যেতে হবে, কি করতে হবে বলে দিন।'

হামিদ-কাকু ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'বলছি সব। আগে সমরেশকে একটু আরাম করে শোয়ানো যাক। তারপর দেখি কি ওষুধ-পত্র আছে আমার কাছে।'

সবাই মিলে ধরাধরি করে সমরেশ-কাকুকে সীট থেকে বের করে এনে শোয়ানো হল। প্রাইভেট প্লেন, জিনিসপত্র নেবার জন্য বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, বাড়তি লোক বসার জন্য কয়েকটা কুশন। তাই বিছানা হল। এতটুকু নড়াচড়াতে বেজায় যন্ত্রণা। অনেক কষ্টে সমরেশ-কাকুকে বিছানায় তোলা হল। না নড়লে নাকি কিছুই টের পাচ্ছিলেন না। এমন কি পায়ের দিকটা খানিকটা অসাড় মতো। তাই শুনে হামিদ-কাকু আরো ঘাবড়িয়ে গেলেন।

নাকু-গামাকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের বারো-তেরো বছর বয়স হয়েছে না ? এতদিন তো শুধু বসে বসে খেয়েছ আর গাছে চড়ে ল্যাজ দুলিয়েছ। এবার একটা মানুষের প্রাণ বাঁচাও তো দেখি। আমি ওকে নিয়ে এখানে থাকি, যেটুকু পারি সেবা করি। এমনিতেও তো হাঁটতে পারব না, পায়ের অবস্থা দেখ।'

দেখে নাকু-গামার চক্ষু-স্থির। পা ফুলে কলাগাছ। হামিদ-কাকু পকেট থেকে ছোট্ট একটা হাতঘড়ির মতো কি যেন বের করলেন।

'এটা কি ?'

ওটা ছিল একটা কম্পাস। কম্পাস এরা আগেও দেখেছিল। দিক্-নির্ণয় যন্ত্র। কাঁটার মুখটা সর্বদা উত্তরে ধ্রুবতারার দিকে ফিরে থাকে। তাই দেখে কোন দিকে যেতে হবে ঠিক করা যায়। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম খাড়া মাঝামাঝি দিকগুলোও দেওয়া আছে।

হামিদ-কাকু বললেন, 'বুঝতেই পারছ, যত তাড়াতাড়ি পার, তোমাদের এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে হবে যেখান থেকে বেতারে খবর পাঠানো যেতে পারে। আমাদের বেতার বিকল। সমরেশকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমাদের সেণ্টারে বেতারে খবর দিলেই রিলিফ্ প্লেন আসবে। তার আগে পায়ে হেঁটে তোমাদের একটা ক্যাম্পে পৌঁছনো দরকার। সে-রকম ক্যাম্প আছেও, এই বনের মধ্যেই। কম্পাস্ দেখে সোজা উত্তর-পুবে চলে যাও। এখান থেকে ষাট-সত্তর কিলোমিটার দূরে আমাদেরই ৫নং ক্যাম্প আছে। তার চেয়ে কাছে আর কিছু নেই। পথও নেই। কোথাও হয়তো নদী-নালা পড়বে। বুনো জানোয়ার আছে, বাঘ, ভালুক, গণ্ডার, অজগর সাপ। পারবে যেতে? ঝড় ঝাপটা, বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।'

হামিদ-কাকুর গলাটা ভাঙা-ভাঙা শোনাতে লাগল। নাকুর গায়ের রক্ত জল। গামা বলল, 'নিশ্চয় পারব।'

হামিদ-কাকু বললেন, 'কেউ তোমাদের সাহায্য করতে আসবে না। বরং এই বনে যদি মানুষের দেখা পাও, তারা হবে বেজায় হিংস্র কুমা-জাতের লোক। তারা তাদের এলাকায় বিদেশী ঢোকা পছন্দ করে না। বনের দেবতাকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে উৎসর্গ করে। একেবারে আদিম।

নাকু বলল, 'গামা এই বনের ছেলে। ওর বাবা বুনি-গাঁয়ের সরদার।'

হামিদ-কাকু অবাক। 'বুনি-গাঁও? বুনি-গাঁও বলে এদিকে কোনো গ্রামের নাম তো শুনিনি!'

গামা লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, না, সে অন্য দিকে। নাকু কিচ্ছু জানে না। আমরা ঠিক যেতে পারব।'

'রাতে কি করবে?'

'কেন, গাছে চড়ব।'

'গাছের ডালে যদি অজগর জড়িয়ে থাকে?'

'দেখে নেব। কোটর থাকলে তাতে ঢুকব। অন্ধকার নামবার আগেই আশ্রয় নেব!'

'কি খাবে?'

'হাল্কা কিছু দিন। তাছাড়া ফল-পাকুড় খাব।'

'যা-তা খেয়ো না।'

হামিদ-কাকু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওদের যাবার তোড়জোড় করে দিতে লাগলেন। সমরেশ-কাকু কাঠ হয়ে পড়ে রইলেন। দুটি টর্চ, দুটি কাটারি, ছোরা, কয়েকটা ওষুধ, কিছু খাবার, দুটি কম্বল, দুটি জলের বোতল, কিছু মোটা দড়ি।

নাকু বলল, 'অত কি দরকার, হামিদ-কাকু? গামাদের গাঁয়ের লোকরা খালি হাতে ঘুরে বেড়ায়।'

হামিদ-কাকু একবার গামার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই সব বনের কোথাও কোথাও কালাজ্বরের ভয় আছে। তোমরা এই ওষুধটাও রাখ। রোজ একটা বড়ি খেয়ো। যাও, ভালোয় ভালোয় চলে যাও। কোন্‌দিকে যাবে বল তো?'

গামা কম্পাস্ হাতে নিয়ে উত্তর-পুব দিক দেখিয়ে দিল।

তিন

হামিদ-কাকুর শেষ কথা, 'তিন দিনের বেশি ঠেকাতে পারব না। যত তাড়াতাড়ি পার যাও!'

সামনে কি ভয়ঙ্কর বন। দেখে নাকুর হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে গেল।

শুকনো গলায় গামাকে বলল, 'এ বনে বড্ড জঙ্গল যে-রে, তোদের বনেও কি এই রকম নাকি ?'

গামা সংক্ষেপে বলল, 'হুঁ'।

এ-ও আরেক গেরো। শহরে থাকতে একবার বনের নাম করলেই হল, অমনি গামার মুখে খই ফুটত। হেনা-তেনা কি যে না বলত, তার ঠিক নেই। তীর দিয়ে ওরা কেমন অজগর সাপ বিঁধে ফেলত ; গণ্ডারের কলজে, কুমিরের ডিম খেত ; দাবানল নেবাত, ফসল বাঁচাতে বনমানুষের পালের সঙ্গে লড়াই করত। অথচ এরোপ্লেনে উঠে অবধি কে যেন ওর মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছিল। ও যে সত্যি বনের ছেলে, সে কথা হামিদ-কাকু কি আর বিশ্বাস করেছেন !

কম্পাস্‌টাতে খুদে একটা আংটা লাগানো। তার ভিতর দিয়ে শক্ত একটু টন্‌ সুতো চালিয়ে, গামা সেটাকে গলায় ঝুলিয়ে নিল। কম্পাস্‌ রইল খাকি শার্টের বুক পকেটে।

'ও কি হল ?'

গামা হেসে বলল 'যাতে না হারায়, তার ব্যবস্থা। ওটা নইলে বন থেকে বেরুনোই এক সমস্যা হবে।'

নাকু চটে গেল। 'কেন, তোমরা না একবার বনের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে, ঝড়-বৃষ্টিতে তিনদিন বে-পথে ঘুরে, তারপর আকাশ পরিষ্কার হলে, সপ্তর্ষি দেখে পথ চিনেছিলে ?'

গামা একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'এবার তিন দিন ঘুরলে চলবে না। যত শিগ্‌গির সম্ভব সত্তর কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ৫নং ক্যাম্পে পৌঁছে, সমরেশ-কাকুকে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। চল, হাঁটা দাও।'

যেই বনের মধ্যে ওরা পা দিল, বনটা ওদের যেন গিলে ফেলল। বাইরে ন্যাড়া জমির লালচে মাটি রোদে খাঁ-খাঁ করছিল, কোথাও কিছুর সাড়া-শব্দ ছিল না ; বনে ঢুকতেই ওদের মাথার উপর যেন কিসের একটা ঠাণ্ডা সবুজ ছায়া নেমে এল। প্রথম প্রথম চোখে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তারপর চোখ সয়ে গেলেই মনে হল চারদিকের গাছগুলো

যেন বড় বেশি কাছাকাছি চলে এসেছে ; তাদের মাথা থেকে বড় বেশি লম্বা লম্বা লতা ঝুলছে ; লতাগুলোর ডাঁটা ওদের হাতের কব্জির সমান মোটা ; কোথাও মাটির উপর দিয়ে গাছ লতিয়ে চলেছে, পায়ে বেধে পড়ে যাবার ভয়। তবু তারি মধ্যে সাবধানে ওরা এগুতে লাগল।

যতই বনের ভিতরে যায়, ততই আলো কমে, গাছের ভিড় বাড়ে। গামা কাটারি বের করে কচাকচ ডালপালা কেটে পথ করে নিতে লাগল। নাকুর বেশ মজা লাগল, সেও গাছ কোপাতে আরম্ভ করে দিল। গামা বলল, 'মিছামিছি গাছপালা নষ্ট করতে হয় না-রে।'

চলেছে তো চলেছেই, কেবলি উত্তর-পুব দিকে। জঙ্গলে দিকের গোলমাল হয়ে যায়, গামা পাঁচ মিনিট বাদে বাদে কম্পাস্ দেখে নিচ্ছিল! ঘন বনে কত লোকে নাকি দিক ঠিক করতে না পেরে, ঘুরে ঘুরে, সাত দিন বাদে যেখান থেকে রওনা হয়েছিল ঠিক সেখানে ফিরে এসেছে। কত লোককে আর পাওয়াই যায়নি।

নাকু রেগেমেগে চেঁচিয়ে বলল, 'ও-সব কথা রাখ। আমার পায়ের তলা গরম হয়ে উঠেছে। চামড়ার জুতো পরে হাঁটা যায় নাকি! কোথাও একটু জিরোনো যাক।'

গামা বলল, 'মাত্র দুই ঘণ্টা হেঁটেই কাবু হলি? এখনি বিশ্রাম কি? চার ঘণ্টা হেঁটে, তবে আধ ঘণ্টা বসলেই হবে। নইলে সময়মতো পৌঁছুতে পারব না।'

তারপর আরো অনেক পরে যখন নাকুর মনে হচ্ছিল সে আর দাঁড়াতে পারছে না, মুখ দিয়ে আগুন ছুটছে, হঠাৎ বন পাতলা হয়ে এল। মাঝখানে একটু ঘাসজমি, একটা তুঁতফলের গাছ, তার নিচে একটা ছোট ডোবা নাকুর মনে হল, স্বর্গের সঙ্গে এর কোনো তফাত নেই।

বনের মধ্যে হাঁটার সময় কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না, শুধু কানের মধ্যে নিজের রক্ত চলার ঝমঝম শব্দ আর মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে হাতুড়ি-পেটার আওয়াজ। কিন্তু থামলেই একশো রকম ছোট ছোট শব্দ কানে আসছিল। দিনের বেলাতেও দূরে কোথায় ঝিঁঝি পোকা ডাক-

ছিল। ঘাসের মধ্যে সড়সড় করে উঠল কিছু। তাতে গামা বলেছিল, 'ঝোপে ঝাপে, বড় ঘাসে, না দেখে পা দিস্-নে।

কোথায় একটা পাখি গাছের গায়ে ঠোঁট দিয়েই বোধ হয় ঠং-ঠং শব্দ করছিল। কোনো ছোট জানোয়ার খড়-মড় করে শুকনো পাতার উপর দিয়ে দিল দৌড়। কিন্তু এই খোলা জায়গাটিতে সে-সব কিছুর ঠাহর হয় না। শুধু থেকে থেকে কিসের কট্‌কট্ শব্দ। গামা বলল, 'ও কিছু না, তক্ষক সাপ হবে বা।'

'সাপ?' নাকু পায়ের ব্যথা ভুলে তিন হাত লাফ দিল। গামা হাসল, 'তাই বলে তক্ষক কি আর সত্যি সাপ? গিরগিটি জাতীয় জানোয়ার। তবে কামড়ায় বলে শুনেছি। গাছের বেশি কাছে না গেলেই হল।'

এ-কথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটু দূরের ঝোপের পিছন থেকে দেড় হাত লম্বা কুমির না কি যেন বেরিয়ে এসে, ওদের দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল। ওদের দিকে চেয়ে একবার গা'টা উঁচু করে তোলে, একবার নামায়, যেন এক্ষুণি লাফ দেবে। নাকু বলল, 'গামা, বিশ্রামে কাজ নেই। চল এগোই!'

গামা বলল, 'চল।' বলে একটা কাঠি তুলে ছুঁড়তেই জানোয়ারটা সড়সড় করে ঝোপের পিছনে ঢুকে গেল।

গামা বলল, 'ওকে গোসাপ বলে। আমরা বলি গোধা। থুতু দেয়। গায়ে লাগলে নাকি ঘা হয়। জুতো-মোজা পরে নে।'

নাকু ডোবার জলে নামল। প্রায় হাঁটু-জল অবধি নামল। তারপর উঠে এল। ঘাসে পা-ঘষে শুকলো। তারপর জুতো-মোজা পরবে বলে আবার বসল। বসেই মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'গ্-গামা, আমার একটা পায়ে ছয়টা আঙুল, একটা পায়ে সাতটা আঙুল কেন?'

গামা উঠে কাছে এল। খানিক নজর করে দেখে, পিঠের থলিটা নামিয়ে রেখেছিল, সেটি খুলল। নাকু এদিকে ভয়ে কাঠ। গামা থলি থেকে একটা শিশি বের করে আনল। তারপর উবু হয়ে বসে নাকুর পায়ের বাড়তি আঙুলগুলোর উপর সাদা কিসের গুঁড়ো ঢালল।

ঢালতেই বাড়তি আঙুল তিনটে খুলে এল। জায়গাটা রক্তে লাল হয়ে গেল।

'ক্-কি, গামা?'

'জোঁক দেখিসনি কখনো? নুন দিলেই মরে যায়। এগুলো বনের জোঁক, একেকটা প্রায় আধ বিঘৎ লম্বা। তোর রক্ত খেয়ে ফুলে উঠেছিল। দাঁড়া একটু আইডিন দিয়ে দিই।'

আরো খানিকটা পরে জুতো-মোজা পরে যখন নাকু উঠে দাঁড়াল, তার মুখে আর হাসি ধরে না। 'ভাগ্যিস্ বনে বনে মানুষ হয়েছিস, গামা, নইলে এত শিখতিস্ কোথায়?'

গামা উত্তর না দিয়ে হাঁটা দিল। আবার বনে ঢুকল ওরা। কেবলি উত্তর-পুবে চলা। চলার আর শেষ নেই। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নাকু বলল, 'বেশ জায়গাটা ছিল।'

'কিছু বেশ নয়, নাকু, একটু নজর করে দেখলেই বুঝতিস্ ওখানে বনের জানোয়াররা জল খেতে আসে। কাদার ওপর পায়ের দাগ। বড় বড় পায়ের দাগ। কোনো ভারী জানোয়ারের গোল গোল পায়ের ছাপ, কাদার মধ্যে গেড়ে বসেছে। চল যতটা পথ পেরুনো যায়, ততই মঙ্গল। অবিশ্যি ভর তুপুরে বেশি ভয় নেই। ওরা আসে সন্ধেবেলায় আর ভোরে।

কোনো গাছের গায়ে প্রকাণ্ড পাতাওয়ালা লতা বেয়ে উঠে, প্রায় আগাগোড়া ছেয়ে ফেলেছে। একটায় বড় বড় হলদে ফুল আর থোলো থোলো লাল ফল ঝুলছে। নাকুর বেজায় লোভ। 'কি চমৎকার গন্ধ রে, গামা! একটু খেয়ে দেখলে হয় না? খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

গামা হাঁড়িমুখ করে বলল, 'যে গাছের ফলে পাখিতে ঠোকরায় না, সে গাছের ফল খেতে হয় না।' গন্ধটা বড্ড কড়া, কেমন মাথা ঝিম-ঝিম করছিল। নাকু সাহস করে কাছে এগিয়ে গেল। এ-ধরনের গাছ যে সত্যি হয়, তার ধারণাই ছিল না। আসল গাছটার গুঁড়ির পাকানো পাকানো জট মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ছিল বটে, বাকিটা সব লতাটা

ঠাণ্ডা চোখ একদৃষ্টে ওর-ই দিকে চেয়ে আছে

ঢেকে রেখেছে।

একটু ভয় ভয় করছিল। কিন্তু গামার কাছে খানিকটা সাহসের পরিচয় না দিলেই নয়। নইলে ফিরে গিয়ে ওর বড্ড বাড় বাড়বে। আর একটু কাছে যেতেই, ফলের থোপার উপরের পাতার গুছি একটু নড়ে উঠল। নাকু চেয়ে দেখল একটা চ্যাটালো মাথা, একটু একটু দুলছে। দুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা চোখ এক দৃষ্টে ওরই দিকে চেয়ে আছে, পলক পড়ছে না। মনে হল একটা হিমের ঢেউ আস্তে আস্তে ওর শিরদাঁড়া বেয়ে উঠছে।

তৎক্ষণে গামা এক পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে ওকে সরিয়ে দিয়েছে। তারপর দৌড় দৌড়, হাঁচড়-পাঁচড় করতে করতে, কখনো হোঁচট খেয়ে, কখনো আছাড় খেয়ে; ডালেতে কাঁটাতে নাকে মুখে হাতে গায়ে আঁচড় লাগে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে গামা থমকে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কাজটা খুব বোকার মতো। ওভাবে অন্ধ হয়ে ছুটলে অনেক অন্য বিপদে পড়া যেত, ভাগ্যিস্ কিছু হয়নি। আসলে সে-রকম বিপদ ছিল না। অজগর জাতের সাপের বিষ থাকে না। খিদে পেলে শিকার গিলে খায়। ওটার গাছ থেকে পাক খুলে নেমে এসে আমাদের তাড়া করবার ইচ্ছে খুব যে ছিল বলে মনে হয়নি। মিছিমিছি ভয় পেয়ে দৌড়ে মরলাম। আয়, এবার কিছু খাওয়া যাক।'

খাবার? বোকার মতো নাকু চেয়ে রইল। খাবারের ব্যাগ তো তারি পিঠে বাঁধা থাকার কথা। পা ধোবার সময় নামিয়ে ছিল। তারপর তবে কি—তবে কি? নাকুর কান্না পেতে লাগল। গামা ব্যাপারটা বুঝতে পারল। 'পরে ভাবা যাবে, নাকু। এখন এতটা পথ ফিরে যাওয়ার সময় নেই আমাদের। যা দৌড়েছি, খুঁজেও পাব না হয় তো। আমাদের সঙ্গে জলের বোতল আছে, পকেটে চকোলেট আছে। তাই খাওয়া যাক।'

নাকু উঠে পড়ল, 'সব আমার দোষেই হয়েছে। তুই তো ওখানে বসতেই চাস্নি। থলে ফেলে এসেছিও আমিই। কিন্তু—দৌড়বার সময়

বুনো শাঁকালুর গাছ দেখেছিলাম না? দাঁড়া।' এই বলে নাকু এক দৌড় দিল।

এক ধারে কালো পাথর, তারি উপর গামা বসে পড়ল। সত্যি কথা বলতে কি একটুখানি না জিরুলেই নয়। তবে জায়গাটা খুব ভালো নয়, সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল না। বড় বড় থাবা বাঘের ছাড়া আর কার হয়? পায়ের গোল ছাপ, ভারী জানোয়ার, নিশ্চয় গণ্ডার। এ সব বনের মাঝে মাঝে লম্বা ঘাসে ঢাকা জমিও আছে। এখানে বুনো হাতিও থাকে। তবে ঐ পায়ের দাগগুলো হাতির নয়। হাতিরা জলে নামে বটে, কিন্তু স্যাৎসেঁতে কাদা জমি এড়িয়ে চলে। গণ্ডারের শিং দিয়ে এরা নানারকম ওষুধ করে। গণ্ডার মেরে মেরে নির্বংশ করার জোগাড়। গণ্ডারের সঙ্গে মানুষের সদ্ভাব নেই। নাকু যেন বড় বেশি দেরি করছে।

'নাকু—উ—উ—উ। এই না—কু—উ—উ—উ!'

চারদিক কি অদ্ভুত চুপচাপ। গামার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। একটু আগেও তো পাখিদের কিচির-মিচির শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে করে গামা পিছন ফিরে তাকাল। অমনি তার ঘাড়ের চুলগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল। এই বড় বাঘিনী! তার হলদে চোখ দিয়ে চেয়ে আছে। মনে হচ্ছে চোখের পিছনে বাতি জ্বলছে। হয়তো এক মিনিট, হয়তো আধ মিনিট। তারপরেই বনের মধ্যে একটা সরু গলার ক্যাঁও-ম্যাও! অমনি বাঘিনী ঘাঁউক করে এক লাফে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হল। সঙ্গে সঙ্গে সে কি গায়ের রক্ত জল করা চিৎকার। ঐ নাকি নাকু। এক মিনিট নড়বার চড়বার শক্তি ছিল না, তারপরেই বাঘের ভয় ভুলে গামাও সেদিকে ছুটল। একটু ঝোপ-ঝাপ নাড়াচাড়ার শব্দ কানে এল। তারপর সব চুপ। গাছতলায় কয়েকটা সরু সরু শাঁকালু পড়ে ছিল।

গামার গলা দিয়ে বিকট স্বর বেরুল। 'নাকু উ—উ!' গাছের উপর থেকে কে বলল 'আঁই যে।' ঐ তো নাকু। এখন মগডালের দিকে উঠে যাচ্ছে। ভয় কেটে যেতেই ভয়ঙ্কর রাগ হল। 'নেমে আয় বলছি।'

বাঘ চলে গেছে

'বা-বাঘ যে।'

'বাঘ চলে গেছে। নাম বলছি, নয়তো ঠ্যাঙ্ ধরে টেনে নামাব।'

নাকু সড়-সড় করে নেমে এল। একটু হেসে শাঁকালুগুলো তুলে বলল, 'চল, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'কি হয়েছিল?'

'আমি বলি দুটো বন-বেড়ালের ছানা। যেই না একটাকে কোলে তুলেছি, অমনি ঝড়ের মতো মা'টা তেড়ে এল। আমি বাচ্চা ছুঁড়ে ফেলে, সটাং গাছে উঠে পড়লাম।'

গামা বলল, 'তা বেশ করেছিস। তাতেই হয়তো আমি বেঁচে গেলাম। তবে এরা সম্ভবতঃ মানুষখেকো নয়। কিন্তু বাচ্চার গায়ে হাত দিলে এক থাবায় ঘায়েল করতে কতক্ষণ।'

'কে বলল মানুষখেকো নয়? আরেকটু হলেই আজকে চিবিয়ে শেষ করত। এক লাফে গাছে উঠে তবে না বাঁচলাম, উফ্!'

'না-রে, ষণ্ডা বাঘ হরিণ-টরিণ তাড়া করে মেরে খায়। দুর্বল কি জখম হলে তবে মানুষ মারে। আর একবার মানুষ মারলে মানুষখেকো হয়ে যায়। আয় খাওয়া যাক।'

চার

বাড়িতে হলে এ-সব নাকু খেত না। মামার বাড়িতে মামার বেজায় কড়া শাসন, সেখানে এ-চাই ও-চাই করা চলত না বটে, কিন্তু এ-খাব-না ও-খাব-না খানিকটা মামিমা সহ্য করতেন। বুনো শাঁকালু কেন, বাজারের শাঁকালুও সে কোনো জন্মে খায়নি। আজ কিন্তু যেই গামা ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ওর হাতে শেকড়টা দিল, ও অমনি সোনা-হেন মুখ করে খেয়ে নিয়ে, আবার হাত পাতল। সত্যি মন্দ নয় খেতে, একটু

মাটি মাটি গন্ধ, একটু চট্‌চটে রসটুকু, তবু বেশ মিষ্টি। তারপর এদিক ওদিক তাকাতেই পেয়ারা গাছ চোখে পড়ল। বুনো পেয়ারা, ছোট ছোট। অর্ধেক পাখিতে ঠুকরেছে। কিন্তু সে-যে কি মিষ্টি! তাই কতকগুলো খেল। তারপর পকেট থেকে চকোলেট খেয়ে, জলের বোতল থেকে দু-চুমুক জল খেয়ে, নাকুই আগে বলল, 'এবার রওনা দেওয়া যাক, কি বলিস, গামা?'

আগে গামা ছিল ওর ভক্ত হনু, বনে ঢুকে অবধি সেই হয়েছে পাণ্ডা।

গামা বলল, 'তোর হাতঘড়িতে কটা বাজল?'

ঘড়িটা নাকুর জন্মদিনে বাবা দিয়েছিলেন, সমরেশ-কাকু পৌঁছে দিয়েছিলেন। মনে আছে হঠাৎ খবর না দিয়ে এসে হাজির। 'তোর না আজ জন্মদিন? এই নে তোর মা-বাবার উপহার, আর এটা আমার।' সমরেশ-কাকুর উপহারটিও কম যায় না, ছোট একটা বাইনোকুলার। এখনো নাকুর বেল্টের সঙ্গে চামড়ার খোলস-সুদ্ধ ঝুলে রয়েছে। গলার কাছটা কেমন ব্যথা ব্যথা করে উঠল। এইভাবে দেরি হয়ে যাচ্ছে, শেষটা যদি সময় মতো সমরেশ-কাকুকে না-ই উদ্ধার করা যায়?

গামা আবার বলল, 'কিরে? কটা বাজল?'

'দুটো বেজে পাঁচ।'

তার মানে ওরা ছয় ঘণ্টা বনে ঘুরেছে। অথচ কতটুকুই বা এসেছে। গামাও লাফিয়ে উঠল, 'চ'-চ' আর দেরি করা নয়।'

এই ছয় ঘণ্টায় বনের গাছপালার মধ্যে যেন একটু তফাত দেখা যাচ্ছিল। বট অশ্বত্থ আম জামের গাছ কমে এসেছিল। মাঝে মাঝে এক ধরনের লম্বা কলাগাছ দেখা যাচ্ছিল। এক জায়গায় বেশ বড় একটা বাঁশবন। এখানে গাছপালা অত বেশি দম-বন্ধ-করা ঘন নয়। তার-পরেই মরা জমি। গামা থমকে দাঁড়াল। এই জমিতেই তার ভয় ছিল। যদি সত্যি তেজস্ক্রিয় কিছু মাটির নিচে থাকে, তাতে যদি ক্ষতি হয়?

নাকু বলল, 'পেরুবি, না ঘুরে যাবি?'

কিন্তু কত দূর ঘুরবে? ডাইনে বাঁয়ে যত দূর চোখ যায়, ন্যাড়া

লালচে মাটি, মাঝে মাঝে ঢেউ খেলানো, কাঁকর বিছানো, এখানে ওখানে কাঁটা-ঝোপ। সোজা সামনে তাকালে, অনেক দূরে মনে হয় ওপারের নীল বনের রেখা দেখা যাচ্ছে। নাকু আবার বলল, 'তেতে রয়েছে-রে। রাতে পেরুতে পারলে ভালো হত?'

গামা মাথা নাড়ল। রাত হতে ঢের দেরি। এখন দিন অনেক ছোট হয়ে এলেও ছটার আগে সন্ধ্যা নামে না। 'বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে রে নাকু! তাহলে আরো তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।'

'কিন্তু এ যে মরুভূমির মতো?'

'মরুভূমিও লোকে পার হয়।'

'থলিতে তুটো গামছা আছে না? বের করা যাক।'

সেই গামছা নালার ঘোলা জলে ভিজিয়ে ওরা ঘাড়, কান ঢেকে, মাথায় জড়াল। ডুমুর গাছের মতো বড় বড় পাতাওয়ালা একটা গাছও ছিল, তার পাতায় কাঠির টুকরো ফুটিয়ে একটা করে টোকার মতো তৈরি হল। আধ ঘণ্টা প্রায় সময় নষ্ট হল। তারপর মুখে চুইংগাম পুরে রওনা।

হয়তো জমিটা খুব চওড়া ছিল না; হয়তো তুই কিলোমিটার মতো হবে। হাঁটতে গিয়ে মনে হল পথ আর ফুরোয় না। জুতোর তলা তেতে আগুন। নিশ্বাসেও যেন আগুনের হল্‌কা।

মাঝে মাঝে কালো কালো পাথর মাথা তুলে রয়েছে। সেগুলি এমনি তেতে আছে যে তার উপর বাতাসটা থিরথির করে কাঁপছে। শুকনো ডাঙায় পাথরের ছায়া পড়ছে, মনে হচ্ছে জল। গামা বলল 'জল নয়, গরমে ওরকম দেখায়।'

হঠাৎ ওরা থমকে দাঁড়াল। সামনেই আগুনের মতো গরম পাথরে পাশাপাশি তুটো কি যেন বসে। দেড় হাত লম্বা হবে, পিঠের উপর খাঁজকাটা ডানার মতো, কুচকুচে কালো, মাথার কাছটা টকটকে লাল।

নাকুর বেজায় ভয়। 'ড্র্যাগনের বাচ্চা নাকি!'

গামা বলল, 'ড্র্যাগন-ফ্যাগন হয় না-রে। তবে হয়তো এই সব

দানো গিরগিটি দেখেই লোকে ড্র্যাগন বলত। কাছে না যাওয়াই ভালো, কে জানে বিষ আছে কি না।'

সে দুটো নড়ল না, ওরা খানিকটা ঘুরে এগুতে লাগল। কি গরম! কি গরম! মাথার গামছা শুকিয়ে খটখটে, পাতার টোকা জ্বলে কালো। মাঝে মাঝে ওরা বোতলের জলে একটু চুমুক দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে চুইংগাম মুখে দিচ্ছিল। দু-জনার হাত-পা রোদে পুড়ে কালি, মুখের মধ্যে জিব শুকিয়ে ফুলে যেন মুখ ভরে রইল।

অনেকক্ষণ কারো কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। তারপর দূরের নীল বনের রেখা যেন অনেক কাছে, অনেক সবুজ মনে হতে লাগল, সে কি চোখের ভুল? নাকু গামার দিকে তাকাল। তাকে চেনাই যায় না। ঠোঁট দুটো কুচকুচে কালো, চোখ টকটকে লাল, কেমন যেন হোঁচট খাচ্ছে। গামা কুপোকাৎ হলেই তো হয়ে গেল। নাকু কি চোখে অন্ধকার দেখছে, নাকি সত্যি সত্যি রোদ্দর তেজ কমে এসেছে। আকাশের দিকে তাকাতেও ঘাড় ব্যথা করে। স্কুলে ড্রিল-মাস্টার বলতেন ঘাড়ে রোদ লাগাতে নেই। সর্দিগর্মি হয়। ওদের ঘাড় অবিশ্যি ঢাকাই ছিল। ভালো করে চেয়ে দেখল নাকু। আকাশে মেঘ জমছে।

কেমন যেন নাকুর গায়ে জোর এল। ছুটে গিয়ে গামার কোমর জড়িয়ে দুজনে দৌড় লাগাল। মরুভূমি হলে বালিতে পা বসে যেত, এখানে কাঁকরের উপর দিয়ে বেশ ছোটা যায়। পা না হড়কালেই হল। খেলও আছাড় দুই একবার, হাঁটু ছড়ল, হাতের তেলো ছড়ল। তাতে কি এসে যায়। ওদিকে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। এক পশলা বৃষ্টিও হল। পাহাড়তলিতে এ-সময়ে এ রকমই হয়। মা বলেন বৃষ্টি যদি পুজো নষ্ট না করে তো আবার পুজো কিসের। অনেক পরে পায়ের নিচে ঘাস ঠেকল। দুজনে পাশাপাশি মাটিতে শুয়ে পড়ল। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছিল। আকাশ কিন্তু কালো মেঘে ঢাকা। চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছিল! যদিও মাত্র পাঁচটা বেজেছিল।

কিন্তু এ তো শুয়ে থাকার সময় নয়। এখুনি রাত পড়বে। রাতের আশ্রয় খুঁজতে হবে, খাবার জোগাড় করতে হবে। খাবার কোথায় পাওয়া যাবে? গামা উঠে বসল। কাপড়-চোপড় ভিজে সপসপ করছে। মনে হচ্ছে শুকনো গা ভিজে জামা থেকে জল শুষে নিচ্ছে। নড়তে শক্তি নাই। গা-ময় বেদনা। 'নাকু, ঐ ছ্যাখ কলার কাঁদি।'

'তাই তো।'

নাকুর ঠাকুরদা জরিপ বিভাগে কাজ করতেন। তিনি বলতেন, এসব বনে ফল পাকে, ফল পড়ে যায়, বাঁদরের দল খবর না পেলে কেউ তোলেও না। ছোট কাঁদি, কিন্তু বেশ বড় বড় কলা। লালচে খোসা ; এসব কলার বড় বড় কালো বিচি থাকে ; খেতে খুব মিষ্টি হয়। এতেই রাতের খাওয়া চলে যাবে। গামার থলিতে কিছু বিস্কুট আছে, পরে দরকার হতে পারে, আজ আর খুলে কাজ নেই। কলার কাঁদি কাটা হল। একটু কম পাকা।

মেঘ দেখে খুব ভরসা হল না। একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার। গামা হঠাৎ বলল, 'এখানে এত পাথর, একটা গুহাটুহাও আছে নিশ্চয়।'

একটা নয়, অনেক গুহা, পড়ন্ত আলোয় চোখে পড়ল। তারি মধ্যে সবচেয়ে বড়টিকে ওরা দখল করল। সঙ্গে কলার কাঁদি ; কিছু শুকনো কাঠও সংগ্রহ হল। কিসের ভাবনা? ওরা গুহার মধ্যে ঢুকল।

গুহায় বিশ্রী গন্ধ। নাকু ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'ওরে, বাঘ-ভালুকের বাসা নয় তো? এখুনি হয়তো শিকারে বেরিয়েছে, খানিক বাদেই ফিরবে। তার চেয়ে একটা গাছে চড়লে হত না?'

গামা বলল, 'আমাদের অবস্থা দেখেছিস? সারা রাত বৃষ্টি পড়বে বাজ পড়াও আশ্চর্য নয়। গাছ-ফাছ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। গুহার মুখে ধুনি জ্বালব। আগুন দেখলে জন্তু-জানোয়ার এদিকে ঘেঁষবে না। কাপড়-চোপড়ও শুকিয়ে নেওয়া যাবে। অসুখে পড়লে চলবে না। তিন দিনের মধ্যে একদিন তো কেটে গেল, কত দূর এলাম কে জানে!'

দেখতে দেখতে প্রায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার আগেই ওরা যত্ন করে

আগুন জ্বেলে ফেলল। অমনি দুর্গন্ধের রহস্য পরিষ্কার হল। গুহার ছাদে ঝোলা শত শত বাদুড় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে বেরিয়ে পড়ল। আলো তাদের সহ্য হয় না। দেখা গেল গুহার মেঝেটাতেও অনেক বছরের লাদি জমে স্তূপ হয়ে আছে। সে আর ওরা ঘাঁটাল না। আগুনের পাশেই একটা খোপ মতো জায়গা, শুধু সেই জায়গাটুকু পরিষ্কার করে নিল। তারপর কাঠিতে কলা ফুটিয়ে একটু ঝলসে নিয়ে খাওয়া। অতি উপাদেয়। আর কি সুগন্ধ। তার কাছে বাদুড়ের ময়লার গন্ধ কি দাঁড়াতে পারে?

পাঁচ

এরই মধ্যে দুজনে মিলে আরো কিছু ডালপালা সংগ্রহ করেছিল। ভিজে ডালে আগুন ধরতে চায় না। হামিদ-কাকু থলিতে ছোট্ট কেরোসিনের শিশি ভরে দিয়েছিলেন, ঠিক এরই জন্যে। তাই ধোঁয়াতে চোখ জ্বালা করতে লাগল বটে, কিন্তু আগুনটাও জ্বলে উঠল। এদিকে বৃষ্টি সামান্য হয়েছিল, উপরের ডালপালা যতটা ভিজা, তলার ডালপালা তত নয়।

নাকু বলল, 'দাদু বলতেন একজন করে জাগতে হয়। পালা করে ঘুমোতে হয়। শেষ রাতে বেশি ঘুম পায়। এখন সাতটা বাজে তুই আগে জাগ। আমাকে রাত বারোটায় ডেকে দিস্। ভোর হলেই রওনা দেব। দেখিস্ ধুনি যেন না নেবে।' এই বলেই নিজের থলিতে মাথা রেখে নাকু চোখ বুজে টান হয়ে শুয়ে পড়ল। গামা বুঝল এ বিষয়ে আলোচনা করতে সে রাজী নয়।

গুহার ভিতরটা ভালো করে দেখা যাক। ঘুম পেলে চলবে না। তাছাড়া গায়ের বেদনা একটু নড়লে-চড়লে আরাম হয়। গুহাটা খুব বড়

ছিল না; মুখের বাঁ দিকে একটা খোঁদল মতো জায়গা; বেশি ঘুপসি নয়, অথচ একটু আড়াল করা। তারি মধ্যে নাকু শুয়ে পড়েছিল। গুহাটা সোজা কয়েক হাত গিয়ে, ডান দিকে মোড় নিয়ে দু-হাত বাদেই শেষ হয়ে গেছে। সে জায়গাটাতে কালো কালো অনেক পাথর ছড়ানো। গুহার দেয়ালও কালো পাথরের, কেমন গা ছমছম করে। তবে কোথাও কিছু নেই, টর্চ জ্বেলে ভালো করে দেখা গেল। কোন হিংস্র জন্তুরও বাসা নয় তাও বোঝা গেল। ছোট একটা পাথর তুলে পকেটে ভরল গামা। আজ রাতের একটা চিহ্ন থাকুক। এবড়ো খেবড়ো একটা পাথর বড় নয়, অথচ বেশ ভারী। ঘষে নিলে কাগজ-চাপা হবে।

নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসে আগুনের কাছে বসল গামা। ইস্, বাইরেটা কি ঘুটঘুটি! গুহায় সামনে একটু জায়গায় আগুনের আভা লাগছে। তাতে বাইরেটা লাগছে যেন আরো অন্ধকার। মনে হচ্ছে গাছপালাগুলো বুঝি বড় বেশি কাছে এসে ঘেঁষেছে। সবই চোখের ভুল। তবু গামা একটু সরে বসল, যাতে ও বাইরে দেখতে পায়, কিন্তু বাইরে থেকে ওকে সহজে দেখা না যায়।

ঝিমুনি ধরলে চলবে না, ধুনিটাকে সারারাত জ্বালিয়ে রাখা চাই। এক সঙ্গে এক গাদা কাঠ পোড়ালেও চলবে না। শেষটা যদি ভোর হবার আগে ফুরিয়ে যায়, তবেই তো হয়ে গেল। ভোরের সময় বনের জন্তুরা জল খেতে যায়। নাকু বলেছিল তখনো ঠিক আলো হয় না। আলো হবার আগেই ওরা গা-ঢাকা দেয়। যদি হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে এক জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করে তা হলে কি করবে, ভেবেও গামার গা শিউরে উঠেছিল। নাকুটা সত্যি ঘুমোচ্ছে কি না কে জানে! অত তাড়াতাড়ি এ অবস্থায় কারো ঘুম হয় না কি!

নাকু তার হাত ঘড়িটা গামার হাতের কাছে পাথরের তাকে রেখেছিল। বারোটা বাজতে খুব বেশি দেরি হল না। নাকুকে তুলতে মায়া লাগছিল, কিন্তু নিজেও খানিকটা না ঘুমোলে কালকের বরাদ্দ কুড়ি কিলোমিটার মতো পথ পার হবে কি করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সোয়া

ঘুটঘুটে অন্ধকার ..তিন জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে৷

বারোটায় গামা নাকুকে আস্তে ঠেলে দিল। গায়ে হাত দেবামাত্র ধড়মড় করে নাকু উঠে বসল। 'কি? কি?'

ওর ফরসা গোলগাল মুখটা দেখে গামার মায়া লাগছিল। কষ্ট করে ওর অভ্যাস নেই। গামার কথা আলাদা। চোখ রগড়ে নাকু হেসে ফেলল। 'বারোটা বেজে গেল? শুয়ে পড়, শুয়ে পড়। সাড়ে চার ঘণ্টা হু-হু করে কেটে যাবে! পাঁচটার আগেই বেরিয়ে পড়া উচিত। কিছু দেখলি-টেখলি নাকি?'

গামা মাথা নাড়ল। 'না-রে। তাছাড়া আমি গুহাটাকে ভালো করে ইন্সপেক্ট করেছি। এখানে বাদুড় ছাড়া কেউ বাস করে না।'—তারপর পকেট থেকে কালো পাথরের টুকরো বের করে বলল, 'এই দ্যাখ্, গুহা-বাসের চিহ্ন নিয়ে যাচ্ছি। তুই চাস্ তো গুহার মধ্যে আরো অনেক আছে। ক্যায়সা ভারী দ্যাখ্ খাসা কাগজ-চাপা হবে।'

এই বলে গামা বেজায় বড় একটা হাই তুলল। 'তোর জলের বোতলেও জল আছে, একটু খেতে পারিস। কলাবনের ওপাশে ছোট্ট নদী দেখেছি, কাল সকালে আবার ভরে নিলেই হবে। তবে একেবারে শেষ করে না ফেলাই ভালো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে গামা ঘুমিয়ে পড়ল।

নাকু একটু জল খেয়ে আগুনের কাছে তার জায়গায় বসল। বসে রাত জাগা সম্বন্ধে দাদামশায়ের মুখে শোনা পুরনো গল্পগুলো মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল। একটা ভালো যে, ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো শুকিয়ে গেছে। শার্টটা আবার পরে নিল নাকু। তারপর বাইরে গাছপালার দিকে তাকাতেই গাটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মাটি থেকে কিছু উপরে তিন জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে। এক জোড়া একটু উঁচুতে, দু-জোড়া অনেকটা নিচুতে। নাকুর বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। তবে যতক্ষণ আগুন জ্বলবে, ওরা আর কাছে আসতে পারবে না, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখনো আগুনের আলোর ঠিক বাইরে বসে আছে। জোনাকির মতো চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

নাকু সাবধানে আগুনের উপর একটা শুকনো ডাল কাঠ ফেলে দিল। যেই না সেটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চোখগুলো আরো খানিকটা পিছিয়ে গেল, কিন্তু চলে গেল না। নাকু সজাগ হয়ে বসল। একবার ভাবল ডাকবে নাকি গামাকে। তারপরেই নিজের উপর রাগ ধরল। গামার তো আর বন্দুক নেই!

সারারাত ঐভাবে চলল। আগুনের আঁচ কমে এলে চোখগুলো কাছে আসে। নতুন কাঠ দিতে যেই সেটা জ্বলে ওঠে, চোখগুলো দশ হাত সরে যায়। তার ফলে সারারাত নাকুর চোখে এতটুকু ঘুম এসে ভর করল না। কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল টের-ই পেল না।

এক সময় দূরে একটা পাখি ডেকে উঠল। নাকু চেয়ে দেখল, পুবের আকাশটা আর তত কালো নেই। চোখ নামিয়ে দেখল নিচু দিকের দু-জোড়া চোখ আর দেখা যাচ্ছে না। খালি এক জোড়া চোখ তখনো জ্বলজ্বল করছে। সারারাত এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি।

দেখতে দেখতে আকাশের তারাগুলো টুপ টুপ করে নিবে যেতে লাগল। নাকু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এ রকম সে কখনো দেখেনি। তখনো চোখ জোড়াকে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু যেই এক গোছা শুকনো পাতা জ্বলে উঠল, এক লাফে একটা কুচকুচে কালো বড়ো জানোয়ার সাঁ করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তার এই বড় কালো ল্যাজটা ঢেউ খেলে শূন্যে উঠে রইল। ঘড়িতে নাকু দেখল চারটে বেজে গেছে। এবার গামাকে ডাকতে হয়। না হয় আরেকটু আলো হক। দু-জনার সঙ্গে দুটি থলি, দুটি জলের বোতল। দরকারি জিনিসপত্র থলিতে পোরা। জলের বোতল বেল্টে আঁটা। তার উপর নাকুর কাছে খাবারের ব্যাগটা ছিল। সেটি নিজের বোকামিতে খোয়া গেছে। মামিমা তাতে লুচি, বেগুনভাজা, মাংসের বড়া, জিবে-গজা ভরে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'দুদিন ধরে খেতে পারবি।' তা অবিশ্যি হত না, তবু বড় ভালো জিনিস ছিল। ফোঁস করে নাকুর নাক দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। গামাকে আর ডাকতে হল না, সে অমনি তিড়িং করে উঠে বসল। 'কিছু

দেখলি নাকি?'

নাকু হাসল, 'আরে না, না, ভোর হয়ে গেছে। আমাদের জিনিস-পত্রও গুছিয়ে ফেলেছি, কিন্তু ঐ ছাখ জোর বৃষ্টি নামল।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁপে জল নামল। চারদিক লেপেপুঁছে একাকার হয়ে গেল। বৃষ্টি নামলে বেরুনো হয় না। নাকু আগুনের উপর আরো কিছু কাঠকুটো চাপিয়ে দিল। গামা থলি থেকে ছোট্ট বিলিক্যান বের করল। তার মধ্যে জলের বোতল থেকে একটু জল, একটু গুঁড়ো দুধ, একটু কোকোর গুঁড়ো, একটু চিনি দিয়ে ফুটিয়ে নিল। ছোট্ট দুটি প্ল্যাস্টিকের পেয়ালা, তার একটুও ওজন নেই, তাই ভরে খাওয়া গেল। বিস্কুটের প্যাকেট থেকে দুখানা করে বিস্কুট নিয়ে দু-জনায় খেল।

তারপর ম্যাজিকের মত বৃষ্টি থেমে গেল, মেঘ কেটে গেল, নীল আকাশ বেরিয়ে পড়ল। ওরা আগুনটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভালো করে নিবিয়ে দিল। জিনিসপত্র ব্যাগে পুরল। কলার কাঁদির দুটি ছড়া বাকি ছিল, দুজনার থলিতে ভাগ করে ভরে নিল। তারপর শেষ একবার চারি-দিকে তাকাল। ঐ যাঃ, আরেকটু হলেই পাথরের তাকে হাতঘড়িটা পড়ে থাকছিল। ভাগ্যিস গামার চোখে পড়ল।

তারপর দু-জনে আবার বেরিয়ে পড়ল। সকালের দিকে রোদ, ঠাণ্ডা বাতাস, গাছের পাতা থেকে টুপটাপ জলের ফোঁটা ঝরছে! ভারি আনন্দ হচ্ছিল। কিন্তু ছোট্ট নদীর জল ঘোলা হয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল, তাই জলের বোতল ভরা হল না।

ছয়

ঘোলা জল তো আর জলের বোতলে ভরা যায় না। নাকু বলল, 'তাতে কি হয়েছে, গামা, অন্য নদীতে পরিষ্কার জল পাওয়া যাবে,

তখন ভরে নিলেই হবে। চল, এগোই।'

দু-জনে বাঁ হাতে ছোট নদী ফেলে রেখে, কম্পাস দেখে এগিয়ে চলল। গামা বলল, 'এখন ঘণ্টা তিনেক হয়তো সব নদীতেই ঘোলা জল দেখা যাবে। মনে হয় পাহাড়ে কাল রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়েছে, এ তারি জল।'

নাকু বলল, 'তাহলে তো আধঘণ্টাতেই নেমে যাবে, তুমি যে বলেছিলে ছোটবেলায় বেড়াতে যাবার সময়, নদীর উপর পাথরে পা দিয়ে পার হয়েছ। তারপর ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি পড়েছে, ফেরার সময় দেখেছ জল বেড়ে গেছে। পাথর ডুবে গেছে। তখন তোমরা নদীর ধারে বসে থেকে দেখেছ চোখের সামনে জল কমে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেকও বসতে হয়নি, জল কমে গিয়ে আবার পাথর দেখা দিয়েছে।'

গামা বলল, 'সে তো পাহাড়ে নদীর কথা বলেছি। তার স্রোতের অনেক বেগ, দেখতে দেখতে জল নেমে যায়। এ সব পাহাড়তলির নদী অনেক আস্তে যায়, জল কমতে সময় নেয়। যাই হক, দু-ঘণ্টা পরেই না হয় জলের বোতল ভরা যাবে, এই তো কোকো খেয়ে বেরুলাম।'

নাকু তাই শুনে খুশি হয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে চলল। তার গোল নরম গাল দুটো হাঁটার সঙ্গে একটু একটু কাঁপতে লাগল। গামার বেশ মায়া লাগল। 'হ্যাঁ রে, এত হাঁটতে তোর কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'মোটেই না, মোটেই না, দেখিস্ দেখতে দেখতে আমার শরীরটাও কেমন শক্ত হয়ে উঠবে। তোর মত শক্ত আর রোগা।'

তবে হয় তো কম খায় বলে গামার গায়ে মাংস নেই। গামাদের অবস্থা বোধ হয় খুব ভালো নয়। যদিও সে বিষয়ে সে কখনো কিছু বলত না। তবু তার সাদাসিধে খাকি প্যাণ্ট-শার্ট দেখেই সেটা বোঝা যেত। ওদের বাড়িতেও কখনো সে নাকুকে নিয়ে যায়নি। বাড়িটা কোথায় তা পর্যন্ত নাকুর জানা ছিল না। অথচ নাকু তাকে মামার বাড়িতে অনেকবার ধরে এনেছে। এতে অবিশ্যি নাকুর একটুও রাগ হয়নি। নিশ্চয় গামার কোনো অসুবিধা ছিল, তাই কখনো যেতে বলত

না। তা ছাড়া ওর বাবা যখন বুনি গ্রামের সরদার, তখন ওদের নিজেদের বাড়ি নিশ্চয় অন্যরকম। সেখানে একবার যেতে পারলে মন্দ হত না। শহরে তো ওর মামার বাড়ি। মামারা হয়তো বন্ধুবান্ধব ভালবাসেন না।

নাকু হঠাৎ বলে বসল, 'বুনিগাঁয়ে একবার আমাকে নিয়ে যাস্, কেমন?'

গামা চমকে উঠে বলল, 'দূর, আমাদের গাঁ অন্য বনে অনেক দূরে। তাছাড়া আমাদের হাতে একটুও সময় নেই। একটা গুম্‌গুম্ শব্দ শুনতে পাচ্ছিস্?'

বাস্তবিক তাই। দূরে কিসের গুম্‌গুম্ শব্দ। যতই এগোয় শব্দ ততই বাড়তে লাগল। এদিকে বনের গাছ খুব মাথায় উঁচু হলেও বন তত ঘন নয়, কাটারি একবারও ব্যবহার করতে হয়নি। ক্রমে গাছপালা আরো পাতলা হয়ে এল। শব্দে কান ঝালাপালা। আরেকটু এগুতেই ওদের চক্ষু স্থির। মাঝারি একটা নদী, তার দু-দিকের পাড়ি খুব উঁচু, সেই উঁচু পাড়ির মাঝখানে একটা খ্যাপা নদী ফুলে ফুঁসিয়ে, ফেঁপে, সাদা ফেনার পাক খাইয়ে, ঘোলা জলের ঢেউ তুলে, গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে।

কম্পাস দেখে গামার মুখ গম্ভীর হল। 'এ নদী আমাদের পার হতেই হবে, নাকু।'

নাকুর হাসি পেল। 'এ নদী হাতিও পার হতে পারবে না। চল্ তীরে তীরে হাঁটা যাক, জল কমলে পার হব?'

গামা মাথা নাড়ল, 'না রে, তা হয় না। আয়, কম্পাস দেখবি।' নাকুকে গামা দেখাল নদীটা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এসে কেমন পুব-দক্ষিণে বয়ে চলেছে। ওদের যেতে হবে ক্রমাগত উত্তর-পূর্বে, হামিদ-কাকু বলে দিয়েছেন। এদিক-ওদিক করতে গেলেই অযথা ঘুরতেও হবে। পথেরও গোলমাল হতে পারে। কাজেই এখানেই পার হওয়া ভালো।

নাকু তো অবাক। 'কি করে পার হবি।'

গামা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ডাইনে কিছু দূরে নদীর

পাড়ির উপর একটা তাল জাতীয় গাছ চোখে পড়াতে তার উৎসাহ দেখে কে! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। ঐ গাছটাকে এমন করে কাটতে হবে যাতে নদীর ওপর দিয়ে পড়ে। ছাখ্, নদী যত চওড়া গাছটা তার চেয়েও অনেকটা লম্বা। ওর মাথা গিয়ে ওপারে পড়বে। ব্যস, দিব্যি এক সাঁকো তৈরি হবে। তার ওপর দিয়ে ওপারে চলে যাব। কাটারি বের কর।'

গামার বুদ্ধি দেখে নাকুর মুখে প্রশংসা আর ধরে না। 'এই রকম করেই তোদের বুনিগ্রামের জঙ্গলে তোরা নদী পার হতিস্ নাকি?'

গামা বলল, 'হুম্।'

এই এক মজা। গোয়ানার জঙ্গলে ঢুকে অবধি গামা আর বুনি-গ্রামের নাম মুখে আনে না, অদ্ভুত!

গাছটা হয়তো সাবুর, কি ঐরকম কিছু। তালের চেয়ে সরু সুপুরির চেয়ে মোটা, ছালটা বেশ এবড়ো-খেবড়ো। কাটারি নিয়ে দু-জনায় কাজে লেগে গেল। নাকু বলল, 'শেষটা যদি নদীর ওপর দিয়ে না পড়ে, এদিকে পড়ে?'

গামা বলল, 'তা পড়তে দেব কেন? গুঁড়িটা সোজা কাটা হবে না। তেরচা করে কাটতে হবে। ডাঙার দিকটা তিন ইঞ্চি উঁচুতে থাকবে; ঢালু করে কাটতে হবে; নদীর দিকটা নিচুতে থাকবে। মড়মড় করে যখন ভেঙে পড়বে, দেখবি নদীর দিকেই পড়ছে। তা ছাড়া পাড়ির ধারে দুটো খুঁটি পুঁতে দড়ি বেঁধে গাছটাকে ওদিকেই টেনে রাখতে হবে।'

ঠিক তাই করা হল। কাজটা খুব সহজ ছিল না। কারণ নদীর দিকে তাকালেই মাথা ঘুরছিল। মাঝে মাঝে পাড়ি ভেঙে পড়েছিল। দেখেও ভয় লাগছিল। কিন্তু গাছটা হাত ছয় সাত দূরে থাকাতে একটু সুবিধা হয়েছিল। খুঁটি পোঁতার সময় গামা নাকুকে বারণ করেছিল, কিন্তু নাকু শোনেনি। মাটি কাঁপছিল, মাথা ঘুরছিল। তবু হাত বাড়িয়ে খুঁটিটা ভালো করে পুঁতে দড়িগাছা বেঁধেছিল। দড়ির অন্য মাথা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল। অন্য খুঁটিটা গামা বাঁধল।

তারপর গাছের গুঁড়ির চারদিকে তেরচা একটা দাগ কেটে নিয়ে

মাটি থেকে একটু উপরে ওরা কোপাতে আরম্ভ করল। গামা বলেছিল যত নিচে কাটবে, লম্বায় তত বেশি পাওয়া যাবে। ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্, খানিক বাদে সত্যি হুড়মুড় করে গাছটা নদীর এপার-ওপার জুড়ে দিয়ে পড়ল। নাকুর কি ফুর্তি।

কিন্তু তারপর? তারপর যে ঐ একটা গাছের সাঁকো দিয়ে খ্যাপা নদী পার হতে হবে। নাকু চোখ ঢেকে বলল, 'পারব না, ডাঙা থেকে জলের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরছে।'

ভয়ঙ্কর রেগে গেল গামা। 'পারবি না আবার কি? পারতেই হবে। সমরেশ-কাকুকে বাঁচাতেই হবে। বের কর তোর দড়িগাছা। এক মাথা তোর কোমরে জড়িয়ে বাঁধ, এক মাথা আমার কোমরে।'

নাকু আর কোনো কথা না বলে দড়িটা ঐ ভাবে বাঁধল। গামা বলল, 'আগে আমি পার হই। যদি পড়ে যাই, দড়ি ধরে আমাকে টেনে তুলতে হবে। এখন আমার জলে ডোবার সময় কোথায়, তাই বল্?' বলে গামা হাসতে লাগল।

নাকুর মুখ সাদা। 'যদি ধরে রাখতে না পারি? স্রোতে বেজায় জোর যে!'

গামা বলল, 'ঐ দেখছিস মোটা বেঁটে গাছটা? তোর কোমরে না বেঁধে, দড়ির এ মাথাটা ওটাতে বাঁধা যাক। পড়লে এমনিতেই আটকে যাব, তখন তুই শুধু টেনে তুলবি। নে, ওঠ। ওপারে গিয়ে তোকেও কেমন পার করি দেখিস্।'

নাকুর গা-বমি করছিল। গামা নিজেই দড়ির অন্য মাথা গাছে বেঁধে দিয়ে আর সময় নষ্ট না করে সার্কাসের দড়াবাজির খেলোয়াড়দের মতো দুদিকে দুই হাত সোজা করে বাড়িয়ে দিয়ে তরতর করে এক মিনিটে ওপারে পৌঁছে গেল।

তারপর একগাল হেসে বলল, 'দেখলি তো কোন ভয় নেই। দড়িটা কোমরে বেঁধে এবার চলে আয়।' বলে অপেক্ষা করে রইল। নাকু গাছ থেকে দড়ি খুলে কোমরে জড়িয়ে বাঁধল। দেখল ওপারে গামা দড়ির

চলে আয়, চলে আয়, সমরেশ-কাকুকে বাঁচাতে হবে না

অন্য মাথাটা একটা গাছে বেঁধে দিয়ে অপেক্ষা করছে।

'চলে আয়, চলে আয়, সমরেশ-কাকুকে বাঁচাতে হবে না?'

সেই নদী পার হবার কথা নাকু জন্মে ভুলবে না। ওপারে তাকিয়ে হামা দিয়ে, গাছ আঁকড়ে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে শেষ পর্যন্ত সত্যি ওপারে পৌঁছেছিল।

সাত

ওপারে পৌঁছে নাকুর গা গুলিয়ে একাকার। গামা যে কি করে ঐ খ্যাপা নদী থেকে বিলিক্যানে করে ঘোলা জল তুলে ওর মুখ কপাল ধুয়েছিল সে গামাই জানে। যাই হোক, খানিক বসে থাকার পর যখন নাকুর পা কাঁপুনি থামল, তখন গামা আবার কম্পাস বের করে দিক ঠিক করে নিল। 'কিরে, এখন হাঁটতে পারবি?' নাকুর হাত-পা পঞ্চাশ জায়গায় কেটে ছড়ে গিয়েছিল। টগবগে নদীর উপর দিয়ে গাছ আঁকড়ে হামাগুড়ি দেওয়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। প্রত্যেকটি আঁচড়ে আইডিন দেওয়া হয়েছিল। খুব জ্বলছিল। তবু গামার মুখে ঐ এক কথা যার উত্তর হয় না। 'আমাদের শরীর খারাপ হলে আর সমরেশ-কাকুকে বাঁচানো যাবে না।' সে কথার কোনো উত্তর নেই। নাকু উঠে হাঁটা দিল।

ক্রমে নদীর দপদপানি ক্ষীণ হতে হতে শেষটা একেবারে মিলিয়ে গেল। পায়ের নিচের জমি ক্রমে ঢালু হতে লাগল। এইভাবে একটু একটু করে উঠতে উঠতে একেবারে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে চড়তে হবে। কিন্তু এত ধীরে ওঠা যে একটুও হাঁপ ধরছিল না। পাহাড়তলির মাটি স্যাঁৎস্যাঁৎ করতে লাগল। গাছপালা আবার ঘন হয়ে উঠল; নাকে একটা সোঁদা গন্ধ আসতে লাগল। লোকালয়ের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। জনমানুষের সাড়া-শব্দ ছিল না। এমন সময় পুবদিক থেকে বয়ে

আসা ছোট একটা নালার দেখা পাওয়া গেল। নালাটা বড় একটা বাঁক নিয়ে আবার তরতর করে পুবদিকেই বয়ে চলেছিল। তার জল টলটলে পরিষ্কার। নিচের নুড়ি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। নুড়ির মাঝে মাঝে খুদে খুদে মাছ সাঁতরে বেড়াচ্ছিল।

নাকু বলল, 'এবার জলের বোতল ভরে নিলে হয় না? বেজায় তেষ্টা পাচ্ছে। সকালের কোকোটা তো তুলেই দিয়েছি।' গামা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস্।' আশ মিটিয়ে দুজনে হাত-পা-মুখ ধুয়ে, আঁজলা ভরে বারবার জল খেল। বোতল ধুয়ে ভরতি করল। জুতো-মোজা খুলে জলে দাঁড়ালে পা দুটোকে কি-রকম ফরসা দেখায়, নাকু অবাক হয়ে তাই দেখছিল।

গামা বলল, 'ছাব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল, কত দূর এলাম কে জানে।' আর বলতে হল না। নাকু তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে, ঘাসে পা মুছে, জুতো-মোজা পরে নিল। বেলা তখন দশটা। বেশ রোদ উঠেছে, কিন্তু মাথার উপর গাছের ডালপালার চাঁদোয়া থাকাতে গরম লাগছিল না। ওরা ক্রমাগত এগিয়ে চলল। এদিককার গাছপালা খুব উঁচু, গাছতলা যেন কেউ ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছে। পাতা-পড়ার সময় হতে তখনো দেরি ছিল। গত বছরের শুকনো পাতা পচে ধসে কবে সার হয়ে গেছিল।

পায়ের নিচে তখনো স্যাঁৎস্যাঁতে ভাব বোঝা যাচ্ছিল। একেক জায়গায় হঠাৎ গাছপালা নেই, লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা জমি। দূরে, অনেক দূরে ছায়ার মতো নীল নীল পাহাড় দেখা দিল। মাঝে মাঝে একটা বড় ডোবা, তার আশেপাশে মানুষের চেয়ে উঁচু ঘাস। গামা হঠাৎ কাঠ হয়ে জমে গেল। ঠোঁটে আঙুল রেখে নাকুকে চুপ করতে বলে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। গণ্ডার! এক সঙ্গে তিনটে, আস্তে আস্তে জলের দিকে এগুচ্ছে। এত দূর থেকেও তাদের গায়ের পুরু চামড়ার অদ্ভুত ভাঁজ, নাকের উপর বেঁটে খড়গ দেখা যাচ্ছিল।

প্রথম গণ্ডারটা হঠাৎ নাক তুলে বাতাসের গন্ধ শুঁকতে লাগল।

তার কাণ্ড দেখে নাকুর বেজায় হাসি পেল। তারপরেই অন্য গণ্ডার দুটোও মুখ তুলে এদিকেই তাকিয়ে রইল। গামা আস্তে আস্তে পিছু হটতে লাগল। সরে সরে ওরা আবার বনে আশ্রয় নিল। ঠিক তখন প্রথম গণ্ডারটা বিকট গর্জন করে ছুটে এল। অমনি অন্য দুটোও এগুতে লাগল।

গামা নাকুর হাত ধরে পাঁই পাঁই ছুট দিয়ে, প্রথম বড় গাছে উঠে পড়ে, পাতার আড়ালে বসে হাঁপাতে লাগল। অনেকক্ষণ ওরা গাছে বসে রইল। আধ ঘণ্টার বেশিই হবে। এখান থেকে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। দৌড়বার সময় কিছু শব্দ কানে আসছিল বটে, কিন্তু বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে অবধি সব চুপচাপ।

দম ফিরে এলে নাকু ফিসফিস করে বলেছিল, 'আমরা তো কিছু করিনি, তবু কেন তেড়ে এল? দাদু তো বলতেন বুনো জানোয়ারের অনিষ্ট না করলে, কিম্বা ভয় না দেখালে ওরা কিছু করে না।'

গামা বলল, 'গণ্ডার বেজায় বদ্‌মেজাজী হয়। চোখে ভালো দেখতে পায় না, জানিস্ তো? কিন্তু দূর থেকে গন্ধ পায়, একটু শব্দ হলেই শুনতে পায়। বোধহয় আমাদের দিক থেকে বাতাস বইছিল, গন্ধ পেয়ে থাকবে। দেখতে কখনোই পায়নি। মাঝে ঝোপ-ঝাপও ছিল। চল্, অনেক সময় নষ্ট হল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই এগুনো যাক।'

ক্রমে বনের চেহারার আরো বদলি হল। এখন আর আম-কাঁঠাল গাছের দেখা নেই। অচেনা সব গাছ, ভারি সুন্দর দেখতে। এদিকে বোধহয় অনেক দিন বৃষ্টি হয়নি। চারদিক শুকনো খট্‌খট্ করছে। গাছপালার বড় রুক্ষ চেহারা। অনেক গাছের গা থেকে দাড়ি-গোঁফের মতো ফিকে সবুজ আগাছা ঝুলছে। দেখে গামা চিনতে পারল। বলল, 'এর ছবি দেখেছি। এগুলোকে ইংরিজিতে লাইকেন বলে।'

শুধু লাইকেন নয়, গাছে কত অর্কিড ফুল ফুটেছে। যেমনি তাদের চেহারা, তেমনি সুগন্ধ। যেন মোমের তৈরি ফুল, ফিকে বেগনি, সাদা, হলুদ, গোলাপি। মোটা মোটা রসাল ডালপালা বাতাসে মেলে

ধরেছে। চারদিক গন্ধে আকুল। এদের কথা নাকুও জানে। এরা বাতাস খেয়ে বাঁচে। গাছের গায়ে হয় বটে, কিন্তু গাছের রস খায় না। যেন স্বর্গের ফুল।

ওরা চেয়ে দেখল দূরের নীল পাহাড়কে এখন অনেক কাছে মনে হচ্ছে। একটা চওড়া নদী এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। তার দুই তীরে বালির চড়া চিকচিক করছে। অদ্ভুত দৃশ্য সামনে। দূরে, নদীর ওপারে একটি পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে ধস নেমেছিল, নিশ্চয় দু'তিন বছর আগে। আরো উঁচুতে ঘন বন দেখা যাচ্ছে। তার নিচে থেকে পাহাড়তলি অবধি গাছপালা নেই, শুধু পাটকিলে মাটি।

সেই মাটির ঢাল বেয়ে কালো কালো কি সব নামছে। নাকু-গামা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ছোট ছোট খেলনার মতো দেখতে। একটার পেছনে একটা স্রোতের মতো নেমে আসছে। নাকুর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। হাতি। বুনো হাতির দল পাহাড় থেকে নদীর দিকে নামছে। এ দৃশ্য ক'জন দেখেছে? উত্তেজনার চোটে নাকুর হাত-পা কাঁপতে লাগল। এতক্ষণে মনে পড়ল তার সঙ্গে জাপান থেকে বড মামার আনা খুদে সিনে-ক্যামেরা আছে। বাবা চেয়েছিলেন। কোমরের বেলটের সঙ্গেই স্ট্র্যাপ করা আছে। নাকুকে বলতেই সে বলল, 'এত দূর থেকে কিছুই উঠবে না, আরো কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু সময় নষ্ট করতে পাবে না। তবে আমাদের ঐ দিকেই এগুতে হবে, তারি মধ্যে যা পার তোলো।'

মনে পড়ল এ-সব জায়গায় কোথাও কোথাও বুনো হাতি ধরার খেদা আছে। হাতির বড় দাম। ধরতে পারলে অনেক হাজার টাকা দিয়ে একেকটা বিক্রি হয়। তাই মাঝে মাঝেই ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় খেদা বসানো হয়। পোষা হাতির সাহায্যেও বুনো হাতি ধরা হয়। প্রথমটা নাকি পাগলের মতো পালাবার চেষ্টা করে। তারপর পোষ মেনে যায়। আর কখনো বনে ফিরে আসতে চায় না। ভেবে নাকুর কষ্ট হল। এদিকে খেদা-টেদা না থাকলেই ভালো হয়।

ততক্ষণে হাতিগুলো ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এসেছে। তাদের কান নাড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওরা এদিকেই আসছে। এ-বনে আসতে হলে ওদের নদীটা পার হতে হবে। সে নিশ্চয় একটা দেখবার মতো ব্যাপার হবে। ঐ সময় একটা ছবি তুলতে পারলে হত। নাকু একবার গামার মুখের দিকে চাইল। গামা বলল, 'কি দেখছ? হাতিরা নদীর ধারে পৌঁছবার আগেই যদি আমরা নদীটা পার হয়ে যেতে পারতাম, তাহলে সবচেয়ে ভালো হত। কিন্তু তা হবার উপায় নেই। মনে হচ্ছে এবই সময় নদীর ধারে পৌঁছব। তার মানে আরো দেরি।'

নাকু বলল, 'কেন?'

গামা কাষ্ঠ-হাসল। 'দেখছ না কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে চলেছে। উপরের পাহাড়ে মনে হয় খরার জন্য খাবার-দাবারের অভাব হয়েছে। তাই ওরা দলকে দল চলে এসেছে। মনে হয় গোটা পঞ্চাশ হবে। ওদের সামনে দেখা না দিলেই ভালো। চল্, নদীর ধারের ঐ বড় গাছে চড়া যাক। তাহলে ওরা আমাদের লক্ষ করবে না। আর তোমারো হয়তো ছবি তোলা হবে।'

বলেই গামা দৌড় দিল। একবারটি কম্পাস দেখে, সোজা তীরের মতো। নাকুও আর অপেক্ষা করল না। নদীর ধার থেকে একটু দূরে ডুমুর গাছের মতো বড় বড় পাতাওয়ালা মস্ত বড় গাছ। এই মোটা তার গুঁড়ি। তারি উপরে গামা চড়ে বসল। সেই ভালো। বুনো হাতিরা গাছে চড়তে পারে না বটে, কিন্তু পাঁচ-সাতজনা মিলে মাথা দিয়ে ঠেলে, গাছ উপড়িয়ে মাটিতে ফেলতে কতক্ষণ?

ওরা আরো কাছে না এলে ছবি তোলা যায় না। কাছে যখন এল, ওদের পথচলার ব্যবস্থা দেখে নাকু-গামা অবাক। আগে-পিছে বড় বড় পুরুষ হাতি। দু-পাশে মেয়ে হাতির দুই সারি আর তাদের মাঝখানে বাচ্চা-হাতিগুলো কিলবিল করে চলেছে। সবার আগে প্রকাণ্ড বড় দাঁতালো পালের গোদা।

নদীর তীরে পৌঁছে তারা থামল। এমনি নিঃশব্দে তাদের চলাফেরা

যে অদ্ভুত লাগছিল। উঁচু পাড়ির উপর মেয়ে-হাতিরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মাঝখানে রইল বাচ্চাগুলো। পুরুষরা সাবধানে পাড়ি বেয়ে নদীর ধারে নামতে লাগল। সবার আগে বড় দাঁতালো পা দিয়ে চেপে চেপে জমি পরখ করতে করতে চলেছে। সে এক দেখবার মতো ব্যাপার।

হয়তো সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকবে। হঠাৎ সে কি বিকট চিৎকার! নাকু-গামা স্তম্ভিত হয়ে দেখে পালের গোদার পাগুলো বালিতে বসে যাচ্ছে! দেখতে দেখতে হাঁটু অবধি তলিয়ে গেল! প্রথমটা একটু হাঁচড়-পাঁচড় করেছিল সে। তাতে আরো তাড়াতাড়ি পা বসে যেতে লাগল। তখন সে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল। তার চিৎকারও বন্ধ হল। গামা ফিসফিস করে বলল, 'চোরা-বালি।'

অন্য হাতিরা কয়েক মুহূর্ত যেন নড়বার-চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর তারা নিঃশব্দে আবার পাড়ি বেয়ে উঠে কিছু দূরের গাছপালার দিকে চলল। বড় বড় ডালপালা ভেঙে শুঁড়ে করে বয়ে, তারা আবার পাড়ি বেয়ে নিচে নামল। নাকু-গামা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগল।

গোদার কাছ থেকে একটু দূরে থাকতেই তারা গোল করে ডালপালাগুলোকে বালির উপর ফেলে, আবার ফিরে চলল। পরের বার ঐ ডালপালার উপর দাঁড়িয়ে আবার গোল করে আরো ডালপালা ফেলল। এমনি করে তিন বারে তারা গোদার কাছে পৌঁছে গেল। গোদার একেবারে সামনে শেষ ক'টা ডাল ফেলে তারা অপেক্ষা করে রইল। গোদা শুঁড়ের চাপ দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল, বালি থেকে নিজের পা উঠিয়ে আনতে।

সে কি চাট্টিখানি কথা! তখন দলের কয়েকটা হাতি এগিয়ে এসে, শুঁড় দিয়ে, পা দিয়ে, তাকে সাহায্য করতে লাগল। চড়চড় করে পালের গোদা বালির ফাঁস থেকে উঠে এল। তখন তারা ধীরেসুস্থে ডালপালার উপর সাবধানে পা ফেলে পাড়ির উপরে উঠে এল।

এতক্ষণ বাচ্চা হাতিরা যেন নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে ছিল। এবার তাদের পায় কে! চেঁচিয়ে-মেচিয়ে চার পা ছুঁড়ে সে যে কি লাফালাফিটাই করল, সে না দেখলে বোঝা যাবে না। মিনিট দশেকের মধ্যে হাতির পাল আবার সারি বেঁধে ফেলল। আবার কয়েকটা পুরুষ হাতির সঙ্গে দাঁতাল নিচে নেমে খুব সাবধানে মাটি পরখ করে করে, পাথুরে জায়গা দেখে, নদী পার হল। বাকিরাও ঠিক সেইখান দিয়ে নিরাপদে এপারে পৌঁছল।

নাকুদের কাছ থেকে হয়তো পঞ্চাশ হাত দূর দিয়ে সেইরকম সারি বেঁধে ওরা গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকল। মনে হল যেন শোভাযাত্রা করে রাজারা চলেছে। দেখতে দেখতে তাদের আর দেখা গেল না। শুধু নদীর ধারে বালির উপর পড়ে থাকল মস্ত বড় গোল করে ফেলা একরাশি সবুজ ডালপালা।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নাকু-গামা গাছ থেকে নামল। এমন আশ্চর্য দৃশ্য কোনো দিনও তাদের দেখার সুযোগ হবে, তারা আশাই করেনি। দেড় ঘণ্টা দেরি হল, কিন্তু এ সময়টা যে নিতান্ত নষ্ট হয়েছে, এ কথা গামার মুখ দিয়েও বেরুল না। সে খালি বলল, 'আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে এই সময়টুকু মেক-আপ করা যাক্।'

আট

বাড়িতে থাকতে খাওয়া-দাওয়ার একটা নিয়মিত সময় ছিল। বনের মধ্যে ঢুকে অবধি কিন্তু নিয়মটার এদিক-ওদিক হচ্ছিল। নাকু বলল, 'তাতে কি হয়েছে, খিদে পেলেই তো খাওয়া উচিত।' গামা বলল, 'খাবার সময়টি যেই হয়, অমনি তোর খিদে পায়, না?' তা পায়। কিন্তু আজ দুপুরের খাবার সময় কখন পেরিয়ে গেছে, কারো কিছু

মনেও হয়নি। এদিকে পিঠের বোঁচকার মধ্যে কালকের আধপাকা কলাগুলো থেকে মিষ্টি গন্ধ বেরুতে লাগল।

বাড়িতে হলে এ-সময়ে কলা খেত না নাকু, যদি না তার আগে মাছ-ভাত থাকত এবং সঙ্গে ক্ষীর কি দই থাকলে আরো ভালো হত। আজ চলতে চলতে কলা খেতে কিন্তু মন্দ লাগল না। এমন কি নাকু না বলে পারল না, 'আসামের পাহাড়ে অনেক জাতি আছে যাদের ছেলেপিলেরা দুধ না খেয়ে কলা খায়।' গামা কিছু না বলে হনহন করে হেঁটে চলেছে দেখে নাকুও আর বাক্যব্যয় না করে পা চালাল।

এখানকার মাটি ক্রমে ঢালু হয়ে এসেছিল। এবার যে এদিকে ভালো বর্ষা হয়নি, তার আরো চিহ্ন দেখা যেতে লাগল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে এ-সময়ে ছোট ছোট নদী নুড়ির উপর দিয়ে হুড়মুড় করে নামে। এবার তার জায়গায় দেখা গেল ন্যাড়া ন্যাড়া পাথর আর নুড়ির মধ্যে ঝিরঝির করে সরু একটা জলের ধারা কোথাও নামছে, কোথাও তাও নেই। শুধু জল নামার নুড়ি ছড়ানো পথটি দেখে বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টি হলে কোথা দিয়ে জল নামে।

পাহাড়তলিতে সাধারণতঃ স্যাঁৎসেঁতে ঘন বন দেখা যায়। সে বড় ভয়ানক বন। এর আগে যে-সব বন ওরা পেরিয়ে এসেছে তার চেয়েও আরো অনেক বেশি ঘন। সেখানে ঢুকতে ভয় করে। এখানকার এই বনে ঢুকতে কিন্তু ভয় করছিল না, কেমন একটা স্ফূর্তি হচ্ছিল। তাড়া-তাড়ি যেতে হবে, তাই চারদিকের শোভা দেখে সময় কাটাবার উপায় ছিল না। কিন্তু চলতে চলতে যেটুকু চোখে পড়ছিল, সেই যথেষ্ট।

এদিকটা কেমন যেন অন্যরকম। পায়ের নিচে মাটির চেহারা আলাদা। জোরে জোরে পা ফেললে ঢপঢপ করে, মনে হয় যেন ফাঁপা। কোথাও কোথাও, হয়তো গত বছরের বর্ষার পরে, মাটি বসে গেছে। ধস নামার মতো খসে নিচে নেমে পড়েনি। এখানকার জমি তত ঢালু নয়, গাছ-গাছলাও প্রচুর আছে। গামা বলল, 'একে ধস নামা বলে না। এদিকের পাহাড় নিশ্চয় নিবে-যাওয়া আগ্নেয়গিরি। বহুকাল আগে

কোনো সময় মাটির তলা থেকে গরম বাষ্প গলা-পাথরের চাপ খেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। সেই কাঁপার চিহ্ন এ-সব।'

নাকু দেখল সত্যিই তাই। এখানকার ভাঙা ভাঙা পাথরের টুকরোকে পাথর বলে মনে হয় না, মনে হয় লোহা কিম্বা ঐ ধরনের কিছু দিয়ে তৈরি। মোমবাতির গায়ে মোম যেমন গলে পড়ে জমে যায়, তারপর তার উপর আরো মোম গলে পড়ে জমে থাকে, এগুলোও ঠিক তেমনি। অদ্ভুত মাটিটাও, খানিকটা কালো মতো, খানিকটা হলদে বালির কথা মনে হয়, সবটা তেল প্যাচপ্যাচে। নাকু এক খাবলা তুলে ব্যাগে না পুরে পারল না।

মাটি তুলতে যেই নিচু হয়েছে কালো কি একটা বন থেকে বেরিয়ে একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। নাকু যেমন হাঁটু মুড়ে ছিল, তেমনি পাথর হয়ে জমে গেল। গামা একটু এগিয়ে ছিল, সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে, ফিরে দেখে এই বড় কালো ভাল্লুক। ছোট ছোট লালচে চোখ দুটো পিটপিট করছে। চার পায়ে হাঁটছিল ভাল্লুক, এবার দুপায়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটোকে সামনে এগিয়ে ধরল। গামা আর অপেক্ষা করল না। কাঁধ থেকে পাকা কলার আধখানা কাঁদি নামিয়ে, যত জোরে পারে নিচের দিকে ছুঁড়ে দিল। কাঁদিটা গড়িয়ে আরো খানিকটা নামতে লাগল। ভাল্লুক নাকের ভিতর থেকে ফোঁড়-ড়-র-র করে একটা শব্দ ছেড়ে থাপুড়-থুপুড় করে কলার পিছনে চলল। ততক্ষণে নাকুর বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে এসেছে। সে-ও তার কলার কাঁদি ঐখানেই রেখে, এক দৌড়ে গামার সঙ্গে বনে ঢুকল। আরো অনেক পরে নাকু বলল, 'এ-সব হল ভালুকের জায়গা। দাদুর কাছে শুনেছিলাম পাহাড়ের নিচে গ্রামের ধারে মহুয়া জাতের গাছের ফল যখন পাকে, ভালুকরা রাতে মহুয়া খেতে বন থেকে বেরিয়ে আসে। ভোরে গাঁয়ের লোকেরা দেখে মহুয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে তারা গাছ-তলাতেই পড়ে আছে। পালাতেও পারে না। তখন তাদের পিটিয়ে মারা খুব শক্ত নয়। গামা বলল, 'ওটা কিছু ভালো কাজ নয়।'

ভালুকের বন, সাবধানে এগিয়ে চলতে হচ্ছে। ঝোপঝাপ দেখলেই মনে হচ্ছে ঐ বুঝি এল। গামা সাহস দিল। মিছিমিছি মানুষ মারে না ওরা। নিরামিষ খায়, মারবেই বা কেন? তবে ভয় পেলে, জখম হলে, কি রেগে থাকলে অন্য কথা। নাকু বলল, 'ভয় পাই তো আমরাই।'

খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল, কান বোঁ বোঁ করছিল। মাথাটাকে হাল্কা লাগছিল। পাঁচ নম্বর ক্যাম্প আর কত দূরে কে জানে? 'ও গামা, ঠিক দিকে চলেছি তো? চারদিক এ-রকম চুপচাপ থমথমে কেন? একটা পাখির ডাকও কতক্ষণ শুনিনি বল্‌তো?'

গামা এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল, 'কে জানে! যে রকম খরা দেখছি, হয়তো জলের অভাবে সব ছোট জানোয়ার পালিয়েছে। খেতে না পেয়ে পাখিরা উড়ে গেছে। আর খিদের জ্বালা সইতে না পেরে বড় জানোয়ারদের কি হয়েছে?'—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে হু-হু-হু হুয়া, খ্যাক-খ্যাক-খ্যাক হুয়া করে বাতাসে ভেসে এল এমন একটা বিশ্রী ডাক যে দু-জনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। 'ক্‌-ক্‌-কি, গামা?' গামা শুকনো ঠোঁট চেটে বলল, 'শেয়াল নয় তো?' নাকু কাষ্ঠ হাসল, 'শেয়াল হলে খ্যাপা শেয়াল। সাধারণ শেয়ালের ডাক এটা নয়।'

ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে অনেক বেলা হয়েছে। বনের মধ্যে থেকে ক'টা বেজেছে ঠিক ঠাওর হচ্ছিল না। কোনো কারণে নাকুর নতুন ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছিল। নাকু বলল, 'নেকড়ে নয় তো?' 'এখানে নেকড়ে-টেকড়ে থাকে না। কিন্তু যাই হোক, মনে হয় খিদের চোটে খেপে উঠেছে।' ডাকটা এখন আরো কাছে মনে হল। গামা বড় গাছের সন্ধানে চারদিকে দেখতে লাগল। বলল, 'এদিক থেকে বাতাস দিচ্ছে, ওদের নাকে আমাদের গন্ধ গেলে আর রক্ষে নেই। পায়ে জোর পাচ্ছি না রে, একটা উঁচু জায়গায় উঠতে হয়।'

গাছ হলেই ছিল ভালো। কিন্তু বড় গাছ চোখে পড়ে না। পাথুরে জায়গা। প্রকাণ্ড সব পাথরের চাঁই, অদ্ভুত আকার নিয়েছে। মনে

হচ্ছে দৈত্যরা ইচ্ছা করে ঐভাবে সাজিয়েছে। তারি মাঝে একটা পাথরের চাঁই চুড়োর মতো উঁচু। আগাটা সরু হয়ে একটা থামের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয় এর মাথায় ওঠা অসম্ভব। কিছু লতা জন্মেছে, তাদের মোটাসোটা ডাল আর শিকড় দেখা যাচ্ছে। গামা বলল, 'আয়।' বলেই চড়তে শুরু করল। সে কি সহজে চড়া যায়। লতার ডাল ধরে ঝুলে, শিকড় ধরে আঁকড়ে, পাথরের খাঁজে পা গুঁজে বহু কষ্টে তারা উঠতে লাগল। কিন্তু খিদের তাড়া বিষম তাড়া। দেখতে দেখতে চল্লিশ-পঞ্চাশটা লালচে মেটে রঙের জানোয়ার তাদের ঘিরে ফেলল। বোঝা গেল এরা পাথর বেয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু উঁচু উঁচু লাফ দিয়েই প্রায় পৌঁছে যায় আর কি! কোথা থেকে হাতে-পায়ে জোর এল নাকু-গামার, মাথায় বুদ্ধি খেলতে লাগল। দেখতে দেখতে পাথরের চুড়োয় পৌঁছে গেল। বাকি রইল থামের মতো শেষ ভাগটুকু। সেটিতে আর চড়া যায় না। হাত ছড়ে গেছে, পায়ের ছাল উঠে গেছে। মন থেকে খিদে-তেষ্টা, সমরেশ-কাকুর বিপদ, সব চিন্তা বিদায় নিয়েছে। একমাত্র ভাবনা কি করে প্রাণটা বাঁচে।

পাথর আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে। অনেক নিচে জানোয়ারগুলো পাগলের মতো পাথরের গোড়ার চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল, যদি কোথাও ওঠার পথ থাকে। ভয়ে ওদের হাত-পা ঠাণ্ডা। ওরা যে-পথে উঠেছে, এদের মধ্যে বেশি দক্ষ যেগুলো তারাই বা সে পথে উঠবে না কেন?

এখন দেখা যাচ্ছে খ্যাপা শেয়ালও নয়, নেকড়েও নয়, বুনো কুকুরের পাল। এদের কুখ্যাতির কথা কে না শুনেছে! হাতিরা পর্যন্ত এদের ভয় করে। কাদায় হাতির পা বসে গেলে, গায়ের পুরু চামড়া ভেদ করে মাংস ছিঁড়ে খায়, এমনি এদের দাঁতের জোর। গামা বলল, 'শোনা যায় এরা আজকাল নির্বংশ হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে কথা ঠিক নয়।'

হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে আছে, জিব লকলক করছে, চোখে খিদের

আগুন জ্বলছে। তারপর ঐ খাড়া পথ বেয়ে একটার পিছনে একটা অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, এক বিঘৎ দেড় বিঘৎ করে উঠে আসতে লাগল।

পাথরের খাঁজে খাঁজে শুকনো ঘাস, আগাছা। নাকু-গামা পাগলের মতো তাই ছিঁড়ে জমা করতে লাগল। সেগুলো পাকিয়ে দুটো মশাল তৈরি করা হল। তার একটাতে গামা দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে সবার আগের কুকুরটার মাথা লক্ষ করে দিল ছুঁড়ে। জ্বলতে জ্বলতে সেটা অনেক দূর নেমে পাথরের খাঁজে আটকিয়ে গেল। অমনি চারপাশের ঘাসে আগুন ধরে গেল। নাকু তখন অন্যটাকেও ছুঁড়ে দিল।

আগুন দেখে কুকুরগুলো বিকট শব্দ করে পাথর থেকে যেমন-তেমন করে নেমে পড়ে বাতাসের বেগে ছুটে পালাল।

সেই প্রথম মশালটা কুকুরগুলোর মাঝখানে পড়ে থাকবে। সেটা বোধহয় নিবে গেল। কিন্তু নাকুর ছোঁড়া দ্বিতীয়টা সোজা নিচে একটা শুকনো ঝোপের উপর পড়ল। অমনি পটপট করে সেটা জ্বলে উঠল। তার উপর জোরে বাতাস দিতেই হু-হু করে একটার পর একটা ঝোপে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। চোখের নিমেষে বনের শুঁকনো গাছগুলোতেও আগুন ধরে গেল।

ততক্ষণে নাকু-গামা পড়ি-মরি করে নিচে নেমে এসেছিল। এ-ও যে কখনো সম্ভব হতে পারে এটা তাদের ধারণার মধ্যে ছিল না। নিচে একটা কুকুর মরে পড়ে ছিল, সেদিকে ওদের লক্ষও রইল না। ওরা স্তম্ভিত হয়ে দেখছিল নিমেষের মধ্যে বনে দাবানল জ্বলে উঠল। ওদের দিক থেকে বাতাস বইছিল; শেষ পর্যন্ত তাতেই ওরা বাঁচল। হু-হু করে আগুন বনের মধ্যে ছুটে চলল। পিছন থেকে দুরন্ত বাতাস যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। পায়ে পায়ে নাকু-গামা আবার গিয়ে পাথরের স্তূপ বেয়ে খানিকটা উপরে উঠে দাঁড়াল। দেখতে দেখতে এদিককার আগুনটুকু জ্বলে জ্বলে আর জ্বালাবার কিছু না পেয়ে নিবে গেল। ভাগ্যিস ছোট ছোট ঝোপ-ঝাপ, শুকনো ঘাস ছাড়া কিছু

ছিল না।

হতবুদ্ধি হয়ে নাকু-গামা বন পোড়ার শব্দ শুনতে লাগল। কেমন একটা ফরফর গনগন আওয়াজ, মাঝে মাঝে কাঠ ফাটার শব্দ। কোথা থেকে এক ঝাঁক শকুন আকাশে উড়ে পড়ল। নাকু-গামা পায়ে জোর পাচ্ছিল না। ধপাধপ করে পাথরের উপর যে যার বসে পড়ল। খিদে-তেষ্টার কথা কারো মনেও এল না। সমরেশকাকুর কি হল বেমালুম ভুলে গেল। তারপর তাদের চোখের সামনেই যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল, সে বিষয়ে তারা বইতে পড়লেও, চোখে দেখবে কখনো ভাবেনি।

আগুন ততক্ষণে বনের মাঝখানে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কিন্তু জঙ্গলের ধারে ধারে ঝোপ-ঝাপের কাঠ-কুটো ডালপালা থেকে কিছু কিছু ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ঘাসগুলির ছাই রঙের, মাঝে মাঝে তখনো গোলা৷পর আভা। তার উপর দিয়ে একটা পাটকিলে খরগোশ দৌড়ে চলে গেল। ভিতরে তখনো আগুন নেবেনি, অমনি পড়পড় করে উঠল। খরগোশ তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে, যে পথ দিয়ে নাকু-গামা এসেছিল, নিচে নামার সেই পথ ধরে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বনে বুঝি জন্তু-জানোয়ারের বাস নেই, এবার সে ভুল ভাঙল। এক পাল হনুমান নিঃশব্দে ছুটে বেরিয়ে সেই পথই ধরল। তারপর একসঙ্গে বনের যত জানোয়ার, সব ভয়ে জ্ঞানহারা হয়ে, খর-খর, সড়-সড়, হুড়-মুড়, দুপ-দাপ করে নদীর স্রোতের মতো বন ছেড়ে পালাতে লাগল। কেউ কারো দিকে তাকাল না পর্যন্ত। হরিণ আর বুনো কুকুরের দল—সেই দলটাই কিনা কে জানে—ভালুক, ভালুকের বাচ্চা, তাদের একটার পায়ে বোধহয় চোট লেগেছিল, মানুষের মায়ের মতো ভালুক-মা তাকে কোলে করে দৌড়ে বেরিয়ে এল। থেকে থেকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে লাগল, দুটো বড় বাচ্চা সঙ্গে আছে কি না। ভয়ের চোটে সবাই যেন রাগ-হিংসা ভুলে গেছিল। সবার একমাত্র চিন্তা, কেমন করে আগুনের কাছ থেকে প্রাণ বাঁচায়।

বেশি বড় জানোয়ার ও-বনে ছিল না নিশ্চয়, কিন্তু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

গো-সাপ, সাপ, গিরগিটি, তক্ষক, বহুরূপী বাদ যায়নি।

তারপর একটা সময় এল যখন তাদের সাড়া-শব্দও বন্ধ হল। তখন নাকু-গামার খেয়াল হল দিন শেষ হয়ে এসেছে, সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। সেদিকের আকাশ আজ আরো অনেক বেশি জায়গা জুড়ে লাল হয়ে আছে। আজ কয় মাইল-ই বা ওরা এগিয়েছে। সমরেশকাকু বেঁচে আছে কি না তাই বা কে জানে। অথচ দু-জনার কারো নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। পাগুলোর যেন এক কুইন্টল করে ওজন, তোলে সে সাধ্য তাদের ছিল না।

আশ্চর্যের বিষয় হল পিঠের বোঝা পিঠেই বাঁধা ছিল, জলের বোতলে তখনো কিছু জল ছিল। এতক্ষণ পরে একটু জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে দুটো করে বিস্কুট খেল ওরা। গলা দিয়ে সে কি নামতে চায়? কি যেন বলতে গেল গামা, খালি একটা ভাঙা ভাঙা খ্যাঁসখেঁসে স্বর বেরুল। খপ্ করে অন্ধকার নেমে এল। ওরা কাঁধের কম্বল গায়ে জড়িয়ে পাথরের থাকের উপর শুয়ে পড়ল। অনেক কষ্টে গলা পরিষ্কার করে গামা বলল, 'অর্ধেকটা দিন নষ্ট হল।' নাকু মুখ গুঁজে পড়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। তার খালি মনে হচ্ছিল 'এই বারো বছর ধরে যে পৃথিবীতে দিব্যি মজায় সে দিন কাটিয়েছে, কে যেন এই দুদিনের মধ্যে ঘাড় ধরে তাকে সেখান থেকে বের করে দিয়েছে। অথচ তবু মনে হচ্ছে তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি। তারপর কখন দু-জনে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

নয়

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, সারা গায়ে কম্বল স্যাঁৎস্যাঁৎ করছে, হিম পড়েছে প্রচুর। এ-সব অঞ্চলে শীত এখন থেকেই জানান দেয়। ওদের সারা গায়ে ব্যথা। ঘুম ভাঙতেই আড়মোড়া ভেঙে সবার আগে সেই

কথাই টের পেল। কিন্তু মনের জড়তাটা গেছে, কালকের সে হতভম্ব ভাব আর নেই। উঠে বসে প্রথমেই খাবারের কথা মনে হল। ঝোলাঝুলি ঝেড়ে দু-জনে যা ছিল সব বের করল। একটা শুকনো পাঁউরুটি বেরুল, ছোট্ট এক টিন চিজ বেরুল, গুঁড়ো দুধ আর কোকোর গুঁড়ো আর চিনি বেরুল। তাছাড়া গোটা কতক বিস্কুট, ব্যস্, ঝুলিতে আর কিছু রইল না।

যেদিকে আগুন লাগেনি সেদিকে প্রচুর শুকনো কাঠকুটো পাওয়া গেল। পাথরের আড়ালে আগুন জ্বেলে খুদে কেটলিতে কোকো তৈরি হল। টিন কাটা সঙ্গে ছিল, চিজের টিন খোলা গেল। ছুরি দিয়ে রুটি কাটা গেল না। শুকিয়ে খটখট করছে। পাথর দিয়ে তাই টুকরো করে নেওয়া হল। তারপর দু-জনে মিলে পেট ভরে খেয়ে নিল। নিজেদের নতুন মানুষ মনে হতে লাগল। পায়ে জোর ফিরে এল, গায়ে বল এল। খাবারদাবার ঝেড়েঝুড়ে শেষ করে, সব গুছিয়ে তুলল ওরা। শুধু জলটুকু যতটা পারে বাঁচাল। কোকোর জন্য দু'পেয়ালা মতো খরচ হয়ে গেল। আবার কোথায় জল পাওয়া যাবে কে জানে!

কাল যা চোখে পড়েনি আজ ভোরের আলোতে সে-সব লক্ষ হল। পাহাড়গুলো এখন কত কাছে এসে পড়েছে। এই ঢালু জমি ক্রমে আরো ঢালু হয়ে উঠেছে। এবার থেকে ঐ খাড়াই বেয়ে ওঠা। জায়গাটা দেখতে বড় সুন্দর। কিন্তু তার মাঝখান দিয়ে কালকের দাবানল চওড়া একটা পোড়া দাগ রেখে গেছে। বাঁ দিকে পাহাড়ের বাঁক ঘুরে দাগটা কতদূর চলে গেছে ঠাহর হল না। নাকু সে দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদু বলতেন খাসিয়া পাহাড়ের সরল-বনে এক একবারে আগুন লাগলে তিন দিন ধরে জ্বলত। পোড়া ছাই বাতাসে উড়ে শহরের বাড়ির উঠোনে এসে পড়ত। রাতে আকাশ হয়ে থাকত লাল। পাহাড়িরা গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে আগুন নেবাত। অত জল কোথা থেকে আনবে। ঝরনা থাকলেও, পাইপ কোথায়? চল্‌রে গামা, মনে হচ্ছে একটা গোটা দিন নষ্ট হয়ে গেল।'

গামা তার কম্পাস বের করে ঠিক করে নিল। তারপর আবার হাঁটা। এ হাঁটায় কষ্ট নেই। খাড়াই হলেও, ধীরে ধীরে উঠেছে। আগুন যে পথে গেছিল, সে পথ বাঁয়ে রেখে, ওরা এগুতে লাগল। মাঝে মাঝে বাঁশঝাড়। নীল আকাশের গায়ে বাঁশের পাতার কি সুন্দর নকশা। এতক্ষণ পরে খেয়াল হল কালকের সেই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ঘুচেছে। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে এক সারি হুপো পাখি উড়ে গেল। তাদের কমলা রঙের মাথা, গায়ে হলুদ কালো ডোরা কাটা। ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস দেখা গেল, সবাই দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে। উত্তরে শীত আর সয় না। বাঁশঝাড়ে এক পাল বড় বড় টিয়াপাখি বসল।

গামা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'হামিদকাকা হতাশ হবেন। আজ তৃতীয় দিন। এখনো পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের কেন, কোনো মানুষের বাসের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।' নাকু বলল, 'কাছাকাছি এলে কি তুমি বুঝতে পারতে?' গামা একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'চা-বাগান দেখা যাবে। তার আগে রিজার্ভ বন পাব। তার চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া থাকবে।'

নাকু বলল, 'এ সব বনে জন-মানুষ থাকে বলে তো মনে হয় না।' গামা একটু কাষ্ঠ হাসল, 'কুমাদের কথা ভুলে গেলে নাকি? তারা সম্ভবতঃ এই এলাকাতেই থাকে। বিদেশী লোক তারা পছন্দ করে না। একটু সাবধানে থাকাই ভালো।'

নাকু ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এ-ও কি গোয়ানোর বন নাকি?' 'কে জানে?' নাকু চটে গেল। 'কে জানে আবার কি, গামা? তোকে বোঝা যায় না। এতদিন ধরে বলেছিস তোর বাবা বুনিগাঁয়ের সর্দার। বুনিগাঁও নাকি গোয়ানোর বনের সবচেয়ে বড় গ্রাম। বনের ভিতরটা তোর সব জানা। আর এখন বনে ঢুকে আর তোর মুখে কথা নেই। কেন বুনিগাঁয়ে গেলেই তো সাহায্য করার লোকজন মিলত। কবে ক্যাম্পে পৌঁছে বেতারে খবর পাঠিয়ে, সমরেশ-কাকুকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা হয়ে যেত। তোর—তোর এই ঠ্যাটামির জন্যই—।' নাকুর

মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। ঠোঁট কামড়ে সে চুপ করল।

গামার মুখটা বেজায় লাল মনে হল। সে শুধু বলল, 'ও-সব কথা ভুলে যা। এখন ঝগড়ার সময় নেই, প্রাণ হাতে নিয়ে চল।' সঙ্গে সঙ্গে ঠিক যেন কোনো ইঙ্গিত পেয়ে সাঁই করে গামার কান ঘেঁষে প্রকাণ্ড লম্বা একটা তীর উড়ে এসে পাশের নিম গাছে বিঁধে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

এত বড় তীর ওরা কখনো দেখেনি : পিছন দিকে একগোছা ছাই রঙের হাঁসের পালকের সঙ্গে একটা আগুনের মতো রঙের মোরগের পালক বাঁধা। ওরা দু-জন আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বিকট চিৎকার করে চার-পাঁচজন বুনো চেহারার মানুষ ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে এসে ওদের ঘিরে ফেলল। প্রত্যেকের পিঠে তূণ, হাতে প্রকাণ্ড ধনুক। পরনে হাফ-প্যাণ্টের সঙ্গে বাঘছালের জামা। কানে মাকড়ি। পান খেয়ে দাঁতগুলোর আর কিছু নেই। কি যে বলতে লাগল তারা নাকু-গামার পক্ষে সেটা বোঝা অসম্ভব। কিন্তু হাবভাব খুব সুবিধার নয়। একেক জনার দুদিকে দু-জন করে দাঁড়িয়ে, বজ্রমুষ্টিতে কনুই চেপে ধরে, তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। একমাত্র সুখের বিষয়, যে-দিকে নাকু-গামার গন্তব্য পথ, এরাও সেই উত্তর-পূর্ব দিকেই চলল।

ঘণ্টা তিনেক হেঁটে যখন ওদের দম ফুরিয়ে এসেছে, তখন দূরে মৌচাকের মতো ঢিপি ঢিপি আকারে খড়ের ঘরের এক গ্রাম দেখা গেল। আরেকটু কাছে আসতেই, সেখান থেকে ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নার সুর শুনে ওদের গায়ের লোম আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে মনে ভয় ঢুকল।

লোকগুলো খুব খারাপ ছিল না। ধরে আনা ছাড়া আর কোনো উৎপাত করেনি। গ্রামে পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই এখানে-ওখানে গাছের গোড়ায় মোরগের পালক রয়েছে চোখে পড়ল। দাদুর কাছে নাকু শুনেছিল, এরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে এইভাবে পুজো দেয়, মোরগ বলি দেয়। কিন্তু এত কান্নাকাটি কিসের? সঙ্গীরা এতক্ষণ

বজ্রমুষ্টিতে কনুই চেপে ধরে, তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলল

লীলা মজুমদার

নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল, এবার তারাও থুম হয়ে গেল। এই-ভাবে গ্রামে এসে ওরা পৌঁছল।

দূর থেকে বাড়িগুলোকে গোল গোল মৌচাক মনে হচ্ছিল, কাছে এসে দেখা গেল তা নয়। অদ্ভুত বাড়ি সব। ছোটগুলোর আকার গোল, চাল গোল হয়ে ঝুলে রয়েছে। বড় দুটি লম্বাটে ধরনের। কিন্তু সবগুলোর একই বৈশিষ্ট্য, গাছের গুঁড়ি খাড়া করে পুঁতে তার উপরে তৈরি। একটা খাঁজকাটা গুঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। মাঝখানের একটি বাড়ি আর সব বাড়ি থেকে একটু আলাদা রকমের। একটু যেন বেশি যত্ন নিয়ে তৈরি, সামান্য একটু বড়ও, তবু বড় দুটির চেয়ে অনেক ছোট। তারি সামনে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে যে বাঘছাল পরা লোকটি বসে, মুঠো মুঠো ধুলো তুলে মাথায় মাখছে, সে-ই যে গাঁয়ের সর্দার সে-কথা আর কাকেও বলে দেবার দরকার ছিল না।

ওরি মধ্যে একটু সোরগোল ওঠাতে লোকটি হাত নামিয়ে ওদের দিকে চাইল। ওদের গা ছমছম করে উঠল। টকটকে লাল চোখে সে কি দারুণ হতাশা! লোকটি বাংলায় বলল, 'তোমরা বাঙালী? আমরা অন্য দিন হলে কখন তোমাদের মেরে ফেলতাম। বিদেশীদের এ-মাটিতে পা রাখতে দেবার নিয়ম নেই। আজ কিন্তু তোমাদের পুজো করব। আমার ছেলে দুটোকে বাঁচিয়ে দাও। তোমাদের কাছে নিশ্চয় হাসপাতালের ওষুধ আছে।' এই বলে ঐ অত বড় মোটা মানুষটা ছুটে এসে নাকু-গামার দু-জনার পা এক সঙ্গে জড়িয়ে ধরতে গেল। যারা ওদের হাত ধরে রেখেছিল, তারা হাত ছেড়ে সরে গেল। নাকু-গামা দেখল সর্দারের আগুনের ভাঁটার মতো চোখ দিয়ে টস-টস করে জল পড়ছে।

গামা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ওদের?' সর্দার কর্কশ ভাঙা গলায় বলল, 'বনের দেওতারা চটে গেছেন, আর কিছু হয়নি। চা-বাগানের ডাক্তার একে বলে কালাজ্বর, আসল ওষুধ না পড়লে কেউ বাঁচে না। আসল ওষুধ এ মুলুকে পাওয়া গেল না। ঘরে ঘরে আমাদের

ছেলেমেয়েরা শুয়ে আছে। কাল রাতে পাঁচজন মরেছে। ওষুধ থাকে তো দাও। আমাদের যা করার সব করেছি। দেওতা মোরগে খুশি হয়নি, ছোট ছেলে নেয়নি।'

এ আবার কি রকম কথা! ছোট ছেলে নেয়নি মানে কি?

নাকু-গামা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর মনে হল - এরি ওষুধ না হামিদ-কাকা দিয়েছিল? সে-কথা মনেই ছিল না, নিজেরাও খায়নি। হ্যাভারস্যাকেই তোলা ছিল। সেই ওষুধ এখন ওরা বের করে দিল। সর্দার তাদের হাত থেকে ওষুধের প্যাকেট ছিনিয়ে নিল। তারপর বলল, 'কিভাবে খেতে হবে বলে দাও।' প্যাকেটের উপর লেখা ছিল। ওরা বুঝিয়ে দিল। সর্দার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বোধহয় দেবতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

গামা সাহস করে বলল, 'এবার আমাদের ছেড়ে দাও তাহলে।' সর্দার ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। কিন্তু ওর পাশে দাঁড়ানো মাথার ফাটায় পালকের সাজ দেওয়া সারা মুখে, গালে, কপালে, সাদা লাল কালো নকশা আঁকা নিষ্ঠুর চেহারার লোকটা কাষ্ঠ হেসে হিন্দিতে বলল, 'তা কি করে ছাড়া যায়? বিষ দিলে কি ওষুধ দিলে কি করে জানা যাবে? ওষুধের ফল দেখে তবে তোমাদের ছাড়া হবে।' সর্দারও তাতে মাথা নেড়ে সায় দিল। অমনি লোকটা অনুচরদের কি যেন হুকুম দিল। তারা নাকু-গামাকে ধরে একরকম কোল-পাঁজা করে একটা ছোট বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে তুলে, ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে দিল। একটা কথাও শুনল না। নাকু কেঁদে ফেলল। গামা রেগে গেল। 'এই কি কাঁদার সময় হল, নাকু? যেমন করেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। নইলে সমরেশ-কাকুকে বাঁচাবার আর কোনো উপায় থাকবে না। জান, আমরা পথ প্রায় শেষ করে এনেছি। পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপে ধাপে চা-বাগান দেখতে পেয়েছি।'

নাকু চোখ মুছে বলল, 'কবে ছেড়ে দেবে কে জানে? আর যদি

ওরা ভালো না হয়?' গামা বলল, 'সেই জন্যই আমাদের পালাবার পথ দেখতে হবে।' ঘরের ভিতরটা বেশ অন্ধকার। চাটাইয়ের মতো বোনা দেয়াল, তাতে জানলা একটাও নেই। কিন্তু বাতাস আসার জন্য ছোট ছোট ঘুলঘুলির মতো কয়েকটা ছ্যাঁদা দিয়ে সামান্য আলো আসছিল। কম আলোতে চোখ সয়ে এলে ঘরের ভিতরটা ওরা ঘুরে ঘুরে পরখ করে দেখতে লাগল।

অস্ত্র থাকলে দেয়াল কাটা খুব শক্ত হ'ত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হ্যাভারস্যাকসুদ্ধ ওদের সব সম্পত্তি ওরা কেড়ে নিয়েছিল। পকেটে আর বেল্টে ঝোলানো যা ছিল সেইটুকুই যা সম্বল। ছুরিগুলো পর্যন্ত ভোরে উনুন ধরাবার কাঠ কেটে ওরা হ্যাভারস্যাকে ভরে রেখেছিল। তবে কম্পাসটা ছিল। আর ঘরের কোণে ছোট এক বাণ্ডিল ধূপকাঠ পাওয়া গেল। এই রজনে ভরা কাঠ জ্বেলে পাহাড়িরা উনুন ধরায়। গামা কাঠগুলোকে একটা একটা করে পরীক্ষা করে একটু মোটা একটু ধারালো, দুটোকে বেছে রাখল। তারপর নাকুকে হেসে বলল, 'এই দিয়ে ছাদ ফুটো করে সটকান দেওয়া যাবে, কি বলিস?'

নাকু বলল, 'কিন্তু ওরা যে দেখতে পেলেই ধরে ফেলবে। তাহলে রাত অবধি অপেক্ষা করতে হয়।' গামা মাথা নাড়ল, 'উঁহু। রাত অবধি থাকা নয়। তার মধ্যে ওষুধ খাবার পর কেউ যদি মরে যায়, তাহলে কি আর ওরা আমাদের আস্ত রাখবে? তাছাড়া বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে রে। হামিদ-কাকু কি করে এতদিন ঠেকাবে?'

নাকু ঢোক গিলে বলল, 'তাহলে কি হবে, গামা?' গামা বলল, 'কেন, ঘুলঘুলি দিয়ে গাছ দেখতে পাচ্ছিস না। ওর ডালপালা বেড়ে এ-ঘরের চালে ঠেকেছে মনে হচ্ছে। ঐ দিকটাতে ছাদ ফুটো করে গাছের মগডালের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাতার মধ্যে লুকিয়ে পড়ব। কেউ টের পাবে না। এদিকে আর ঘরটর নেই। তারপর ও গাছের ডাল থেকে পাশের গাছের ডালে, সেটা থেকে তার পাশের গাছে, তারপর এক সময় নেমে পড়ে দে-দৌড়। চল্, আর দেরি করা নয়। ওরা ওষুধ-

পত্র দিতে ব্যস্ত আছে।

যেমন বলা তেমনি কাজ। গামার কাঁধে চড়ে, কাঠ দিয়ে খুঁচিয়ে, দেখতে দেখতে নাকু ঘাসের চালে বেশ একটা ফাঁক বানিয়ে ফেলল। তারপর নেমে ঘুলঘুলি দিয়ে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে প্রথমে কাকেও দেখতে পেল না। তারপর কান্নাকাটি থেমে কেমন একটা সুর করা গোঙানি কানে এল। ওরা কাঠ হয়ে দেখল, বড় ঘরের একটা থেকে বাঁশে বেঁধে পাঁচটা মরা মানুষকে নিয়ে গাঁয়ের পুরুষরা অনেকেই বনের পথ ধরে রওনা দিল। ওদের গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। ঘুলঘুলি থেকে চোখ সরাতে পারল না। সর্দারের ঘরের দোরগোড়ায় একবার সর্দারকে আর সেই নিষ্ঠুর লোকটাকে দেখা গেল। তারপর তারা আবার ভিতরে ঢুকে গেল। গামা বলল, 'এইবার।'

আর মুহূর্তও অপেক্ষা করা নয়। প্রথমে নাকুর কাঁধে চড়ে গামা ফুটো দিয়ে ছাদে উঠল। তারপর ছাদে শুয়ে পড়ে, দুহাত বাড়িয়ে নাকুকে টেনে তুলল। তারপর হাত দিয়ে যথাসম্ভব ফুটো বন্ধ করল। তারপর দুজনেই ছাদে শুয়ে শুয়ে গাছের পাতায় আড়াল নিল। তারপর ডাল বেয়ে ওঠা খুব শক্ত কাজ ছিল না। দু-জনেই গাছে চড়ায় ওস্তাদ। তাই নিয়ে মামার কাছে কম সাজা পায়নি নাকু। আর গামা তো বনের ছেলে, তার যে এ-সব বিদ্যা রপ্ত থাকবে সে তো জানা কথা।

একগাছ থেকে আরেক গাছে যাওয়া খুব শক্ত না হলেও, নিঃশব্দে কাজটা সারা খুব সহজও ছিল না। পুরুষরা বেশির ভাগ বেরিয়ে গেলেও মেয়েরা কেউ কেউ ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত ছিল। একটা রাঙা আলুর ক্ষেত দেখা যাচ্ছিল, সেখানেও অনেকগুলো আধবুড়ি মেয়ে কাজ করছিল। তবু কেউ লক্ষ করেনি। খেতটাকে একটু দূরে রেখেই ওদের এগুনো। যেই গ্রামের বাড়ি চোখের আড়াল হল, ওরা গাছ থেকে নেমে নিঃশব্দে দৌড় দিল। কারো কোন সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। এ-দিকটা হল পুরুষরা যে-পথে গেছিল, ঠিক তার উল্টো দিকে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওরা অনেক দূর চলে এল। দূরে আরো নীল নীল

পাহাড় দেখা গেল। তাদের গায়ে ধাপে ধাপে চায়ের বাগান। এই বাগানই গামা আগেও দেখেছিল।

ঘড়ি চলছিল না। কত বেলা হল ওদের কোনো ধারণাই ছিল না। আকাশ মেঘে ঢেকে গেছিল। এদিকের খরা এবার ঘুচবে মনে হল। কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা এসে গেল, ওদের খেয়াল ছিল না হঠাৎ আলো কমে গেল। বনের মাঝে খানিক খোলা জায়গা, ওরা সেখানে পৌঁছে, অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

দশ

এক নিমেষে দু'দিনের সব গ্লানি মন থেকে মুছে গেল। ঘাস জমিতে একপাল হরিণ চরছে। বেশ বড় বড় হরিণ, নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ঘাস খাচ্ছে। দশ-বারোটা মেয়ে হরিণ, সঙ্গে পাঁচ-ছটা বাচ্চা। পালের গোদা একটা পুরুষ হরিণ, ডালপালাওয়ালা এই বড় বড় তার শিং। পিঠের রঙ গাঢ়, বাকি শরীর একটু ফিকে। সম্ভবতঃ শম্বর জাতেরই হবে। মেয়েরা নিশ্চিন্তভাবে চরছে, কিন্তু দলপতি থেকে থেকে মাথা তুলে বাতাসে কি যেন শুঁকছে। আবার মাথা নিচু করে ঘাস খাচ্ছে।

নাকু-গামা একটু উঁচুতে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সামনে কিছু ঝোপ-ঝাপ। তবু দলপতি কোনোরকমে টের পেয়ে থাকবে, এক মুহূর্ত কাঠ হয়ে থেকে হঠাৎ চড়বড় করে উঠল। অমনি যত মেয়ের দল, বাচ্চার পাল, এক নিমেষে তীরবেগে বনের গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেল। নাকু-গামা ভাবতে লাগল—সত্যি হরিণ দেখল, নাকি ভেল্‌কি। এ জায়গাটা আরো একটু ঠাণ্ডা, হরিণের গায়েও সমতল জমির হরিণের চেয়ে বেশি লোম।

ক্রমে বেলা বাড়ার সঙ্গে খিদের জ্বালাও বেশি হতে লাগল। চারদিকে

ওরা চাইতে লাগল। খালি হাত, সঙ্গের সাথী হ্যাভারস্যাকগুলোও বেহাত হয়ে গেছে। এক বড়ি ওষুধ পর্যন্ত নেই। খালি চলা আর চলা। বন খুব ঘন না হলেও, গাছের নিচে থেকে আগাছা মাঝে মাঝে পা জড়িয়ে ধরে। জলের বোতল খালি, তেষ্টায় ছাতি ফাটার যোগাড়। মনে বড় ভাবনা, একে একে তিন দিন কাটল, আর কি সমরেশ-কাকুকে বাঁচানো যাবে। নাকু বলল, 'এত সাবধান করে দিলেন হামিদ-কাকু, আর আমরা কিছুই করতে পারলাম না।' গামা বলল, 'বাজে বকিস্ না। ওদের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসাটাকে কি তুই কিছু নয় বলতে চাস্? চল্, হাঁটা দে। এখনো কিছুক্ষণ দিনের আলো আছে।' আরো হাঁটল ওরা। হেঁটে হেঁটে যখন আর পারা যায় না, তখন একটু বসে পড়তে হয়। তারপরই উঠে আবার হাঁটা। একেকবার বসে, আবার ওঠার সময় যেন একটু বেশি করে কষ্ট হয়। মনে ভয় ঢোকে, শেষটা একবার হয়তো বসে পড়ে আর ওঠার শক্তি থাকবে না।

দিনের আলো বাঁকা হয়ে পড়তে লাগল, গাছগুলোর ছায়া লম্বা হল, রোদটাতে লালচে রঙ ধরল। ওরা আর বসবার সাহস পেল না। কোনো কথা না বলে, থেকে থেকে হোঁচট খেতে খেতে ক্রমাগত উত্তর-পুব দিকে এগিয়েই চলল। পাখিরা কিচিরমিচির করতে করতে সব বাসায় ফিরতে লাগল। তবু মাথার উপরে অনেক উঁচুতে দেখা গেল হাঁসের পাল, সারসের দল, ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, তখন ওদের কি হবে? জিজ্ঞাসা করাতে গামা বলল, 'ওদের সব নিয়ম বাঁধা। রাতের বিশ্রামের জায়গা, দিনের বেলায় চরবার জায়গা, সব ঠিক করা। বছরের পর বছর ওরা একই সময়ে একই জায়গায় নামে।'

তারপর আর বুনোহাঁস দেখা গেল না, যে যার জায়গায় রাতের মতো নেমে গেছে নিশ্চয়। এবার অনেক নিচু দিয়ে, গাছের মাথার একটু উঁচুতে অনেক কালো বাদুড় দেখা গেল। ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে, যেন কালো কালো খোলা ছাতা। তারপরেই কানে এল বিশ্রী

একটা চ্যাঁ-চ্যাঁ ঝগড়াঝাটির শব্দ। গামা যেন খুশি হয়ে সেই দিকে দৌড়ে গেল। পড়ন্ত আলোয় দেখা গেল পাকা পাকা ন্যাসপাতির ভারে মাটি অবধি ঝুলে পড়া ডালপালা নিয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ-ছ'টা ন্যাসপাতি গাছ। আর তাদের ঘিরে পনেরো-কুড়িটা বড় বাছড়। তাদের গা থেকে ভ্যাপসা গন্ধ বেরুচ্ছে। আর কোনো কথা নয়। মাটিতে পাথরের টুকরো পড়ে ছিল, তারি গোটাকতক তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারতেই, অনেকগুলো বাছড় উড়ে পালাল। তখন কাছে গিয়ে নিচু নিচু ডাল থেকে ফল পাড়া খুবই সহজ হয়ে গেল। সে কি মিষ্টি ফল! কামড় দিতেই কস বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ল। পর পর অনেকগুলো ফল একেক জনে খেয়ে ফেলল। খিদে-তেষ্টা একসঙ্গে মিটল।

খাবার পর পথ চলা আরো কঠিন বলে মনে হতে লাগল। পকেট ভরা ন্যাসপাতি; থলি-ঝুলি কিছু নেই সঙ্গে যে বেশি করে নেবে। তবু গামা হার মানবার ছেলে নয়, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তবে বুদ্ধিটা এল নাকুর মাথায়। দেখে কয়েকটা কলাগাছ, তাতে ফলটল বা মোচা কিছুই নেই। কিন্তু বড় বড় পাতা আছে, বুড়ো পাতার শক্ত শক্ত শিরা আছে। তবে আবার থলি ঝুলির জন্য ভাবনা কিসের? দেখতে দেখতে ওরা কলাপাতায় মুড়ে, কলাপাতার শিরা দিয়ে বেঁধে, দুটো ন্যাসপাতির পুঁটলি বানিয়ে ফেলল।

কাজে কর্মে কিছুটা সময় গেল, আরো খানিক আঁধার নামল, পা যেন আর চলে না। তবু কোনোমতে আরো খানিকটা এগুল। চোখে আর ভালো করে কিছু ঠাহর হয় না, তারি মধ্যে দেখতে পেল হাঁটুজল একটা ঝিলের মতো, মাঝে মাঝে মাটির চড়া উঁচু হয়ে রয়েছে, আর তারি উপরে হাজার হাজার বুনো হাঁস রাত কাটাবার জন্য নেমেছে। সব নিস্তব্ধ নিথর। ডানায় মাথা গুঁজে হাঁসরা স্থির। ছাই ছাই সব রঙ, সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে আছে। তাদের দেখে কি জানি কেমন একটা আশ্বাস পেল এরা দু-জনে। তারাও রাতের আশ্রয় খুঁজতে লাগল।

সে রকম ভালো গাছ কি বড় একটা গুহাটুহাও চোখে পড়ল না। ভালো করে দেখাই যাচ্ছিল না কিছু! তারি মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার। একটা বড় গাছ দেখে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল। কানে এল এক ঘোঁৎ ঘোঁৎ আঁউ আঁউ শব্দ। অবাক হয়ে দেখে মস্ত গাছটার উপরের ডাল থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা তক্তা ঝুলছে। গুঁড়ির পেছনে মস্ত মৌচাক। এইভাবে ভালুকের উপদ্রবের কাছ থেকে মৌচাক বাঁচানোর কথা ওরা আগেও অনেক শুনেছিল। আজ এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেল। ভালুক-বাচ্চা মধু খাবে বলে ভালুক-মা দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝোলানো তক্তাটা সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বাচ্চা যেই মৌচাকের কাছে মুখ তোলে, অমনি তক্তাটা দোল খেয়ে আবার ফিরে আসে। বাচ্চা মধু না পেয়ে আঁউ আঁউ করে ওঠে। মা রেগে গিয়ে আরো জোরে ধাক্কা দিয়ে তক্তা ঠেলে দেয়।

দেখতে দেখতে এক ভয়াবহ কাণ্ড হয়ে দাঁড়াল। যত জোরে মা তক্তা সরায়, তক্তা তত জোরে ফিরে আসে। শেষটা ঠাঁই করে বাচ্চার মাথায় জোরে এক বাড়ি লাগল। বাচ্চা কুঁই-কুঁই করে উঠতেই, মা দারুণ জোরে তক্তাটাকে আবার ধাক্কা দিল। তক্তাও তেমনি জোরে ফিরে এসে বাচ্চার মাথায় লাগল। বাচ্চা একটা গোঙানির মতো শব্দ করে পড়ে গেল।

ওরা আর দাঁড়াল না। অসহ্য ক্লান্তির কথা ভুলে গিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল। আরো অনেক পরে আরো কয়েকটা বড় বড় গাছ দেখা দিল। নাকু-গামাকে আর কিছু বলতে হল না। তারা তারি মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে, ব্যথা শরীর দুটোকে কোনোরকমে টেনে টেনে তার উপর উঠে গেল। বেশ খানিকটা উঁচুতে গুঁড়ি দু-ভাগ হয়েছে। সেখানে বেশ আরামের একটা বসবার জায়গা তৈরি হয়েছে। পুঁটলি নিয়ে গাছে চড়াও চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ পুঁটলি নিচে ফেলেই বা যায় কি করে। ফলের গন্ধে নিশ্চয় ভালুক এসে হাজির হবে। এ-সব জায়গা তাদের এলাকা।

উপরে উঠে হাত-পাগুলোকে একটু মেলে, গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে, ক্লান্ত শরীর ছুটো একটু আরাম পেল। আরো খানিক বাদে নাকু বলল, 'গামা, গাছের ডালে তক্তা বাঁধা মানেই এখানেও বনবাসীদের গ্রাম আছে, কাছাকাছি কোথাও।' গামা বলল, 'হুম্'। আরো খানিক বাদে গামা বলল, 'এ-সব জায়গা চা-বাগানের এলাকা থেকে খুব দূরে নয়। শুনেছি এখানেও বড় কালাজ্বরের ভয়। আমাদের সঙ্গে ওষুধ-টষুধও নেই যে ছুটো বড়ি খাব।'

নাকু কোনো কথা না বলে পকেট থেকে ছুটো বড়ি বের করে দিল। বুদ্ধি করে কয়েকটাকে রেখেছিল। ক্রমে অন্ধকার আরো ঘন হল, ওদের ঝিমুনি আসতে লাগল। না ঘুমিয়ে আর উপায় রইল না। হতে পারে ভালুক গাছে উঠতে পারে। ন্যাসপাতির গন্ধ পেয়ে এই গাছে ওঠাও কিছু বিচিত্র নয়। নাকু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বলল, 'দে তো তোর ন্যাসপাতির পুঁটলি। ও ছুটোকে একটু নিচের ডালে ঝুলিয়ে রাখি। ভালুক উঠলেও আমাদের কিছু বলবে না, ন্যাসপাতি খেতেই ব্যস্ত থাকবে।'

ন্যাসপাতি ঝুলিয়ে ফিরে এসে ওরা প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। এমন সময় কানে এল বিশ্রী একটা চ্যাঁ-চ্যাঁ কান্নার মতো আওয়াজ। নাকু চমকে ওঠাতে, গামা বলল, 'ও কিছু নয়। শকুনের বাচ্চা ঐ রকম মানুষের ছেলের মতো করে কাঁদে। কাছে কোথাও মরা জানোয়ার ফেলার ভাগাড় আছে হয় তো। তাবি কাছে-পিঠে শকুনের বাসা। গ্রাম নিশ্চয়ই বেশ কাছে। এখন ঘুমো। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে বেরুতে হবে। আর ওদের হাতে পড়া নয়।' এই বলে সে আবার চোখ বুজল।

কিন্তু কান্নার শব্দ আর থামে না। নাকুর চোখ থেকে ঘুম বিদায় নিল। বাড়িতে রাতে ঠিক এমনি করে ছোট বোনটা কাঁদে। এই অন্ধকার বনে ছোট বোনটা যদি একলা এমনি করে কাঁদত তাই ভেবে নাকুর গা শিউরে উঠল, চোখ জ্বালা করতে লাগল। সে আস্তে আস্তে উঠে

বসল। গামা চুপচাপ। নাকু একটা নিচের ডালে পা রেখে, আরেকটা ডাল ধরল। একটু খচমচ শব্দ হয়ে থাকবে, গামা অমনি আস্তে আস্তে বলে উঠল, 'কিরে ?'

'নাঃ, কিছু নয়, তবু একবার দেখে আসি।' ডালের উপর জুতো-মোজা পড়ে রইল, নাকু খালি পায়ে নিচে নেমে এল। গামা ভারি বিরক্ত। 'বলছি ওটা কিছু না, শকুনের ছানার কান্না, তা শুনবে না। যাক্ গে, যা ইচ্ছে করুক! আমি নড়ছি নে।' ততক্ষণে নাকু নিচে পৌঁছে গেছিল, শুনতেও পায়নি।

নিচে নেমে দেখে তত অন্ধকার নয়, একটুখানি চাঁদের আলো রয়েছে। মনে হল কান্নার শব্দ কোনো গাছের উপরে শকুনের বাসা থেকে আসছে না, মাটি থেকেই আসছে। খুঁজে পেতে বেশি দেরিও হল না। লতায় পাতায় জড়িয়ে বাঁধা কাদের ছোট্ট ছেলে একটা গাছ-তলায় পড়ে পড়ে কাঁদছে। তারি পাশে কিছু মোরগের পালক পড়ে আছে। নাকু অমন বাঁধা অবস্থায় ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে, লতাপাতা ছাড়িয়ে ফেলল। ছেলেটাও অমনি ওর বুকে মুখ গুঁজে একেবারে চুপ। শুধু থেকে থেকে তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

ছোট্ট ছেলে, হয়তো বোনটার মতোই হবে, মাস আষ্টেকের মনে হল। সমানে নাকুর ময়লা শার্ট চুষে খেতে লাগল। ভালোই লাগছিল বোধহয়। একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে নাকুর মুশকিল হল, সেই বড় গাছটাকে আর খুঁজে পায় না। এমন সময় কে যেন ঘাড়ে ঠাণ্ডা হাত রাখল। আঁতকে উঠে ছেলেটাকে ফেলে দেয় আর কি। খালি-গা বাচ্চাটা বেজায় পিছ্লা। তার উপর সারা গা বেশ ঠাণ্ডা। কানে কানে গামা বলল, 'চুপ! আমি! সেই ইস্তক তোকে খুজছি। এই নে, ধর তোর জুতোমোজা। ওটাকে আমার কাছে দে।'

গামা ন্যাসপাতির বাণ্ডিল আর জুতো নিচে নামিয়ে রেখে বাচ্চাটাকে নিল। নাকু জুতো পরতে পরতে, গাছতলায় লতায়-পাতায় জড়ানো

ছেলেটাকে পাওয়া আর তার পাশে মোরগের পালকের কথা বলল। শুনে গামা ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আর এক মিনিটও নয় এখানে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চল্, পালাই। নিশ্চয়ই বুনোরা ছেলেটাকে দেবতার কাছে মানত করে রেখে গেছে। আমাদের ধরলে আর রক্ষে নেই। এখানেও হয় তো কালাজ্বর।'

তারপর আবার দৌড় আর দৌড়। কোন দিকে গ্রাম কে জানে। ভুলে সেদিকে গেলেই তো হয়ে গেল। ক্রমে নাকে সুঁটকি মাছের গন্ধ এল। ওরা থমকে দাঁড়াল। তারপরেই উল্টো দিকে কোনাকুনি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। নিশ্চয় কোনো গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

ভাগ্যিস খানিক ঘুমিয়ে পাগুলোতে আবার বল ফিরে এসেছিল, নইলে কি আর পেরে উঠত। মাঝে একবার থেমে, নিজেদের গলার কম্ফর্টার খুলে ছেলেটার গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর থেকে আর থামেনি। ক্রমাগত কেবলি উত্তর-পুবে ছুটেছে। তারি মধ্যে আরেক জ্বালা। একটা কালো রঙের কুকুর এসে ওদের সঙ্গ নিল। কিছুতেই আর ছাড়ে না। প্রথমটা দাঁত খিঁচিয়ে অন্ধকারের মধ্যে থেকে নিঃশব্দে দৌড়ে এসেছিল। প্রকাণ্ড বড়। দেখেই ওদের আত্মাপাখি খাঁচা-ছাড়া।

বুনোদের কুকুর নয় তো! দাদুর কাছে শোনা, প্রাচীন গুহার দেয়ালে আঁকা সব ছবিতেও মানুষের সঙ্গে কুকুরের চেহারা দেখে বোঝা যায়, সেকালেও লোকে কুকুর পুষত। কিন্তু এটা বড় অ্যালসেসিয়ান। বিদেশী কুকুর নিশ্চয় বুনোরা পুষবে না। এটা যে পোষমানা সেটা ভালো করেই বোঝা গেল, যখন গলার ভিতর থেকে একবার একটা ভয়াবহ ঘড়্-র্ শব্দ করেই কাছে এসে দু-জনকে, বিশেষ করে ছোট ছেলেটাকে শুঁকে, আহ্লাদে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কুকুরটা ওদের আগে আগে চলল।

গামাকে বলাতে সে বলল, 'তাহলে কি গলায় একটা কলার থাকত না? যাই হোক, ওর সঙ্গে গেলে ক্ষতি কি? ও-ও তো উত্তর-পুব দিকেই চলেছে।'

ক্রমেই পুব দিকের আকাশের রঙ্ ফিকে হয়ে এল। চারদিকের দৃশ্য আবছায়া দেখা যেতে লাগল। বোঝা গেল ওরা ক্রমাগত পাহাড়ের ঢাল বেয়েই এতক্ষণ এসেছে তবে এত ধীরে ধীরে ঢালুটা উঠেছে যে বেশী হাঁপ ধরেনি।

কুকুরটা মাঝপথে একবার থেমে, ওদের দিকে চেয়ে একটু ল্যাজ নেড়ে, উর্ধ্বশ্বাসে এক দিকে ছুটল। তখন ওদের কানে এল দূর থেকে কোলাহল। তবে কি এত দূর এসে শেষ পর্যন্ত সেই বুনোদের কবলেই পড়তে হ'ল? কুকুরটা কি তবে তাদেরি চর? বাচ্চাটাকে তাহলে কি করে বাঁচানো যাবে? নাকু-গামা ফ্যাকাশে মুখ করে এ-ওর দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ গত তিন দিনের সমস্ত হতাশা, সমস্ত ক্লান্তি ওদের পেয়ে বসল। পা টলতে লাগল, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। তবু ছেলেটাকে আঁকড়ে ধরে নাকু দৌড়তে আরম্ভ করল। এমন সময় ঢাক-ঢোলের সঙ্গে সঙ্গে কানে এল কে যেন দূরে চ্যাঁচাচ্ছে 'ও নাকু-গামা-আ-আ। তোরা কোথায় গেলি?'

এগারো

নাকুকে থমকে দাঁড়াতে দেখে গামা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কেউ ডাকছে না, ওসব আমাদের মনের ভুল। ধরলেই আমাদের মেরে ফেলবে। চল, চল, যেমন করে পারি, যেখানে পারি।' ওঠে আর পড়ে ওরা, গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়, শেষ পর্যন্ত এত দিনের পথ-প্রদর্শক কম্পাসটিও দড়ি ছিঁড়ে কোথায় ছিটকে পড়ল। পাগলের মতো গাছের তলার আধা-অন্ধকারে ওরা হাতড়ে বেড়াল, কিন্তু সে আর পাওয়া গেল না। ওদের চোখে তখন উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম সব গুলিয়ে গেল। তার উপর বাচ্চাটাও জেগে উঠে বেজায় কাঁদতে লাগল।

নাকু বলল, 'কান্না শুনেই ধরে ফেলবে আমাদের। দে না ওর হাতে ছোট একটা ন্যাসপাতি। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।' গামা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। কোথায় ন্যাসপাতি? সেই যে নাকু জুতো পরার সময় গামা ন্যাসপাতির পোঁটলা মাটিতে নামিয়েছিল, আর তোলা হয়-নি। গামা প্রায় কেঁদে ফেলে। রেগে বলল, 'তোর জুতো পরাই য ন্তষ্টের গোড়া! আরেকবার খাবারের থলি হারিয়েছিল।' নাকু বলল, 'তাতে কি হয়েছে? ওর মুখটা চেপে ধরি, তাহলে আর শব্দ বেরুবে না।' ছেলেটার মুখ চেপে ধরে ওরা দৌড়তে লাগল।

বোঝা গেল শত্রুরা আরো অনেক কাছে এসে পড়েছে। দুটো-চারটে পটকার শব্দ, শিঙার আওয়াজ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের ডাক। আর তো দৌড়ে পারবে না ওরা। পায়ের কাছে ছোট পাহাড়ী নদী। নাকু উঠি-পড়ি করে তারি জলে নেমে পড়ল। কনকনে জলের প্রবল স্রোত পায়ের কব্‌জি ধরে যেন টানাটানি করতে লাগল। গামা বলল, 'কি রে?' গামা বনের ছেলে, পোষা কুকুরের কি জানবে? নাকু বলল, 'জলে নামলে কুকুরে আমাদের গন্ধ পেয়ে ধরতে পারবে না।'

তাই চলল দু-জনে। বাচ্চাটা নাকুর কোলে রাগে ফুলতে লাগল। একবার হাত সরে যেতেই সে কি কান ফাটানো চিৎকার! ম্—ম্—ম্—আ—আ! এই নাকি কাল রাতে শকুনের বাচ্চার মতো ট্যাঁ-ট্যাঁ করছিল! নাকুর একটু ভয় ছিল, বুনোদের বাচ্চা নিয়ে এসেছে বলে না আবার বিপদে পড়তে হয়! এবার বোঝা গেল তা নয়, বুনোরাই নিশ্চয় ওকে চুরি করে নিয়ে গেছিল। হাতে বড় বড় টিকের দাগ, গলায় একটা সোনার মাদুলি। বেজায় ফরসা রং। এ তো বনের ছেলে নয়। ঠাণ্ডায় পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। হাঁটুর নিচে বোধ নেই। দুবার জলে বসে পড়ার পর, গামা নাকুকে টেনে আবার ডাঙায় তুলল। নাকু পাগলের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কোলে বাচ্চাটা তেমনি ধরা রইল, কিন্তু তার মুখ থেকে হাত কখন সরে গেছিল আর সে তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কালো যমদূতের মতো কুরটা জঙ্গলের আড়াল

থেকে দৌড়ে এসে নাকুর বুকে লাফিয়ে পড়ল। নাকু ছেলেটাকে বুকে নিয়েই মাটিতে পড়ে গেল। কুকুরের বিকট ডাকে চারদিক ভরে গেল।

গামা কোথায় যেন শুনেছিল যে যখন আর বাইরে থেকে কোনো সাহায্যের আশা থাকে না, তখন নিজের মনের মধ্য থেকেই সাংঘাতিক বল পাওয়া যায়। ওর এবার ঠিক তাই হ'ল। গা থেকে সমস্ত দুর্বলতা দূর হয়ে অসুরের মতো জোর এল। এক লাফে বিকট কুকুরটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কান দুটো ধরে লাগাল হ্যাঁচকা টান। কুকুরটাও অমনি নাকুকে ছেড়ে গামার কাঁধের কাছে কামড়ে ধরল। নিজেরই অজান্তে গামার মুখ দিয়ে একটা বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল। চোখে সে ঝাপসা দেখতে লাগল।

তারি মধ্যে হাটু গেড়ে বসে পড়েও মনে হ'ল রক্তাক্ত দেহে নাকু লাফিয়ে উঠে ছেলেটাকে কোলে নিয়েই এক দিকে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু একটা দৈত্যের মতো ষণ্ডা লোক ছেলেসুদ্ধ তাকে জাপটিয়ে ধরল। গামা জোর করে মাথা দিয়ে চোখ থেকে অন্ধকার ভাবটা দূর করবার চেষ্টা করতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে টের পেল কুকুরটা কখন ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। চারদিকে লোকজনের ভিড়। কি যেন বলছে তারা, বেজায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি সব জিজ্ঞাসা করছিল। কথাগুলো গামার কানে ঢুকলেও মাথায় ঢুকছিল না।

চারদিকটা অস্পষ্ট হয়ে এলেও গামা দেখল নাকু বেজায় হাত-পা ছুঁড়ছে। কে যেন ছেলেটাকে ওর কোল থেকে তুলে নিতে চেষ্টা করছে, ও প্রাণপণে তার একটা ঠ্যাং আঁকড়ে ধরে রেখেছে। তারপর যখন বুঝল আর পারা যাবে না, দিল তার আততায়ীর হাতে প্রচণ্ড এক কামড়। সে বেচারাও পরিষ্কার বাংলায় "উরি, বাবারে গিছি-গিছি-গিছি-গিছিরে।" বলে ছেলেটাকে দিল ছেড়ে। আর নাকুও অমনি ছেলেটাকে নিয়ে আবার ছুটবার তালে ছিল। কিন্তু যাবে কোথায়? ততক্ষণে তাদের ঘিরে ফেলেছে একদল লোক, তাদের কারো হাতে বন্দুক, কারো হাতে মোটা লাঠি, পরনে সকলের খাকি পোশাক।

কালো যমদূতের মতো কুকুরটা   নাকুর বুকে লাফিয়ে পড়ল

খাকি পোশাক কেন? বনবাসী কি কখনো আগাগোড়া খাকি পরে?

নাকু হঠাৎ ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'হামিদকাকু-উ-উ! আমরা যে কিছুই করতে পারলাম না।' তারপর যা ঘটল সেটা সত্যি না স্বপ্ন বুঝতে গামার কিছুটা সময় লাগল। মনে হল ভিড় ঠেলে প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া যে লোকটা এগিয়ে এসে ছেলেসুদ্ধ নাকুকে জড়িয়ে ধরল, সে হামিদ-কাকু ছাড়া কেউ নয়।

তাহলে নিশ্চয়ই সেই মরাজমির ধারে এতক্ষণে সমরেশ-কাকু আর হামিদ-কাকু দু-জনেই মরে গেছে। যেই না মনে হওয়া গামা অমনি ডুকরে কেঁদে উঠল। 'ও হামিদ-কাকু, তাহলে কি তোমরা দু-জনেই মরে গেছ?'

সঙ্গে সঙ্গে হামিদ-কাকুর সে কি ধমক। 'মরে গেছি আবার কি? মরা লোকরা কি চারটে ডিম ভাঙা দিয়ে আটটা স্লাইস্ রুটি খায়? আমি তাই খেয়েছি।' কথাটা গামার ভারী মজার লাগল। সে তখনি কান্না ছেড়ে বেজায় হাসতে লাগল। হো-হো হি-হি করে সে কি অট্টহাসি! সে আর কিছুতেই থামতে চায় না!

কে যেন ওর গালে এক চড় মেরে ঘাড় ধরে ঝাঁকি দিল। 'চোপ্! পুরুষের কাজ করে আবার ন্যাকা মেয়ের মতো হিস্টিরিয়া হচ্ছে!' এমনি রাগ হল যে সঙ্গে সঙ্গে হাসি-কান্না দু-ই সেরে গেল। মাথা ঘুরিয়ে লোকটার দিকে তাকাল। দেখল সে একটা পরিষ্কার রুমাল দিয়ে গামার হাতের জখম জায়গাটা চেপে ধরে আছে। দু-জনারই শার্ট রক্তে ভেসে যাচ্ছে। লোকটা একটু হেসে ভাঙা গলায় বলল, 'ওটা আমার ছেলে। বুনোরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তোমরা ওরে বাঁচালে।' বলেই চুপ করল। গামা ফ্যাল ফ্যাল করে একবার তার দিকে, একবার নাকুর দিকে, একবার হামিদ-কাকুর দিকে চেয়ে, জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, 'তা হলে সমরেশ-কাকু নিশ্চয় মরে গেছেন। আপনি বলেছিলেন, তিন দিন ঠেকাতে পারবেন। তিন দিন তো হয়ে গেছে।'

হামিদ-কাকু নাকুর গলার ক্ষত স্থানটার উপর রুমাল বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'সে এখন সদরের বড় হাসপাতালে দিব্বি আরামে ঘাড় থেকে

কোমর অবধি প্লাসটার কাস্টে মোড়া হয়ে শুয়ে আছে। তার জন্য ভাবতে হবে না।'

নাকু হঠাৎ রেগে খনখনে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে কি হল বলুন শিগ্‌গির।' হামিদ-কাকু বললেন, 'কি আবার হবে। আমরা সময় মতো পৌঁছচ্ছি না দেখে, তোমার বাবা যেই খবর নিয়ে শুনলেন আমরা ঠিক সময়ে বেরিয়েছিলাম, অমনি রিলিফ প্লেন আমাদের খোঁজে বেরুল। প্রথম রাত্রেই আমি খোঁড়া পা নিয়ে নেমে মরা ঝোপে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা তাই দেখে ভোরে আমাদের উদ্ধার করে আনল। কিন্তু তোমাদের খুঁজে খুঁজে সবাই হয়রান, এই সার্চ পার্টির সঙ্গে আমি, আরেকটার সঙ্গে তোমার বাবা আছেন।'

এই অবধি শুনে হঠাৎ নাকু-গামা দু-জনেই ঝুপ করে এক সঙ্গে মুচ্ছো গেল। কখন কিভাবে তাঁদের জীপে তুলে ৫নং ক্যাম্পে আনা হ'ল কেউ টের পেল না। সেখানে ডাক্তার তাদের ওষুধ দিয়ে, ব্যাণ্ডেজ করে, ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন।

বারো

পরদিন ভোরে চোখ খুলে নাকু দেখল তার বিছানার এক পাশে মামণি, একপাশে বাপি। আর গামা উঠে বসে হামিদ-কাকুর সঙ্গে লাল পেয়ালা থেকে কোকো খাচ্ছে।

মামণি হয়তো খুব কেঁদেছিল, চোখগুলো লাল লাল মনে হ'ল। বাপি বেশি কথা না বলে খালি ব্যাণ্ডেজের উপরে হাত বোলাচ্ছিল। তারপর গলা খাঁকার বলল, 'কুকুরটা আসলে বেজায় ভালো। ওর নাম টাইগার। কিস্কুর ছেলে হারাবার পর ও-ই শুঁকে শুঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কাল রাত থেকে কোথায় যে গেল কেউ বুঝতে

পারছিল না। আবার আজ সকালে এসে হাজির। তোদের আক্রমণ করেছিল কারণ ও ভেবেছিল তোরা বুঝি কিস্কুর ছেলেটাকে নিয়ে পালাতে চাস।'

নাকু উঠে বসে বলল, 'বাপি, গামা কি খাচ্ছে, আমিও খাব।' বাপি বলল, 'গামা ? ও, রমেশের ছেলের নাম বুঝি গামা ? তা বেশ নাম। গামা খুব বিখ্যাত পালোয়ান ছিল।' নাকু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, গামা রমেশের ছেলে হবে কেন। গোয়ানার জঙ্গলে বুনি গাঁওয়ের সরদার ওর বাবা। ওরা খালি হাতে বাঘ তাড়াতে জানে। তাই তো আমরা সব বিপদ কাটিয়ে আসতে পারলাম। গামা যদি বনের ছেলে না হতো, তাহলে কি আর পারতাম ?' হামিদ-কাকুর সে কি হাসি। 'দূর, দূর, রমেশদাও আমাদের পাইলট ছিলেন। পাঁচ বছর আগে প্লেন ক্র্যাশ করে জখম হয়ে এখনো বিছানায় পড়ে আছেন। ওর মা যে তাঁর কি সেবাটাই করেছেন, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কেন, তোকে কিছু বলেনি বুঝি ? আমি বলি দু-জনায় কত ভাব!'

গামা বেজায় লজ্জা পেয়ে বলল, 'ইয়ে—ইয়ে—না—না সে রকম কিছু নয়—না হয় ডট পেনটা দিস্ না।' নাকু বলল, 'দিস্ না আবার কি ? নিশ্চয় দেব। কোথায় গেল আমার সার্টটা, এক্ষুণি দিচ্ছি। মা, আমার শার্ট ?'

মামণি মহা অপ্রস্তুত। 'ওরে, টাইগার যে সেটাকে চিবিয়ে শেষ করেছে। কি হবে ?' হামিদ-কাকু লাফিয়ে উঠে বললেন, 'ঐ যাঃ, ভুলেই যাচ্ছিলাম। কিস্কুদা তোমাদের দু-জনার জন্য এই দুটো দিয়েছে। ওর ছেলে উদ্ধারের পুরস্কার।'

পুরস্কার দেখে নাকু-গামা হাঁ! দুটি লম্বা বাক্স। তাতে একটি করে ডট্ পেন, একটি ফাউন্টেন পেন। গামা বলল, "তা-তা-তা তো-তো-তো!" নাকু বলল, 'হ্যাঁ—ইয়ে—ঐ!'

এ গল্পের আর খুব কমই বাকি রইল। গামা যে বনের ছেলে নয়; সে যে ছোটবেলা থেকে নাকুর মামার বাড়ির ছোট শহরে, তার মামার

বাড়িতে মানুষ। বনে কোনো দিন যায়ও নি ; বন-জঙ্গল সম্পর্কে সে যা জানে সবই তার বই-পড়া বিদ্যা। এতদিন নাকুদের সবাইকে গাঁজা-খুরি মন-গড়া গল্প বলে বোকা বানিয়ে এসেছে, এ-সব কথা মনে করে, প্রথমটা নাকু বেজায় চটে গেছিল। গামার দিকে পিঠ ফিরিয়ে সারাদিন শুয়েছিল, একটা কথাও বলেনি, গামাও সাধাসাধি করেনি।

সন্ধ্যাবেলায় যখন ম্লান মুখে রোগা একজন ভদ্রমহিলা গামার পাশে এসে বসলেন, গামা তার কোলে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। আধ-ঘণ্টা পরে হামিদ-কাকুর সঙ্গে তিনি আবার চলে গেলেন। গামা বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। নাকুর খুব খারাপ লাগছিল। কিছু পরে গামার ব্যাণ্ডেজ বদলাবার জন্য ওকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আরো পরে বাপি এসে বললেন, ঐ নাকি গামার মা। হেড-কোয়ার্টারের কাছেই ছোট একটা বাড়িতে গামার রুগ্ন বাবাকে নিয়ে থাকেন। কাজ করতে গিয়ে জখম হবার জন্য বাবা যা পেনশন পান, তাইতে ওঁদের কোনোরকমে চলে। মা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অক্লান্তভাবে তাঁর সেবা করেন। এদেশে তাঁর ভালো হবার সম্ভাবনা নেই। তবে যদি ভিয়েনা নিয়ে যাওয়া যায়, সেখানে অপারেশন করে নিশ্চয় একেবারে ভালো হয়ে যাবেন। কিন্তু তার অনেক খরচ। গামা মামার বাড়িতে থেকে পড়ে, সব সময় বছরে একবারও মা-বাবাকে দেখে যাবার সুযোগ পায় না। এ-সব কথা কারো কাছে বলেও না কিছু। তবে নাকুর মামা-মাসি সবই জানেন। তাই গামা সঙ্গে আসবে শুনে এত খুশি হয়েছিলেন। এ-সব কথা শুনে নাকুর সে কি দুঃখ। টাকা পেলেই গামার বাবা সেরে উঠে আবার এরোপ্লেন চালাবেন ? কেন, কোম্পানি থেকে টাকা দেবে না ? বাপি বললেন, "রমেশ যদি পার্মানেণ্ট হতো তাহলে যদি বা কিছু করা যেত, অস্থায়িভাবে মাত্র তিন মাস কাজ করার পর দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। কোম্পানি যতটা সম্ভব তার চেয়ে বেশিই করেছিল। এখনো নানাভাবে সাহায্য করে। গামার পড়ার খরচ দেয়। কোনোরকমে যদি কিছু

টাকা পাওয়া যেত—।' হঠাৎ নাকু লাফিয়ে উঠে, দেয়ালের হুকে টানানো গামার ময়লা পেণ্টেলুনের পকেট থেকে এক টুকরো কালো পাথর বের করে এনে বাপির হাতে দিল। বলল, 'কি রকম ভারী দেখেছ? এটা কি বলতে পার? কাঁচা হীরে নয় তো?' বাপি পাথরটা হাতে নিয়ে চমকে উঠলেন, 'এ কি রে, এ কোথায় পেলি? সেখানে নিশ্চয় টাংস্টেনের আকর আছে। আরে এর জন্য সরকার অনেক টাকা দেয়। এ-সবের সন্ধান করাই তো আমার কাজ।'

নাকুকে তখন পায় কে! নিজের পকেট থেকে পাহাড়ের গা থেকে তোলা সেই তেল-তেলা মাটিও এক খাবলা বের করে বাপিকে দেখাল। তবে ওটা বাপির জানা জায়গা। ওখানে নাকি কিছুদিন পরেই পেট্রলের জন্য নল বসানো হবে। তারপর মহা খুশি হয়ে বাপি বললেন, 'আরে তোরা যে বেজায় হেঁটেছিস দেখছি। আমরা তো জীপ আর ঘোড়া নিয়ে ওখানে গেছিলাম। তোদের মেডেল দেওয়া উচিত।'

নাকু বলল, 'টাংস্টেনের টাকাটা গামুকে পাইয়ে দিয়ো, বাপি, তা হলেই হবে।'

হল-ও তাই। তবে কিছু সময় লাগল। এই ঘটনার আট মাস পরে, গামার বাবা ভিয়েনা গিয়ে সম্পূর্ণ সেরে এলেন। ততদিনে নাকু-গামা মামা বাড়ির সেই ছোট শহরের স্কুল ছেড়ে বড় শহরের বোর্ডিং-এ এক সঙ্গে ভর্তি হয়েছিল। একই ক্লাসে দু'জনে পড়তে লাগল। বলা বাহুল্য গামাই সর্বদা ফার্স্ট হয়। কিন্তু নাকুর মতো ছবি আঁকতে কেউ পারে না। গোয়ানার বনের অভিজ্ঞতা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না, বলে এতগুলো রোমাঞ্চকর ঘটনা তিন দিনের মধ্যে কখনো ঘটে নাকি? নাকু-গামার মনে হয় বনের বাইরে শহরে গ্রামে না ঘটতে পারে কিন্তু নেফা কিম্বা গোয়ানার বনে যারা গেছে, তারা সবাই জানে যে বাইরের কোনো নিয়ম ঘোর জঙ্গলে খাটে না!

●